রোমাঞ্চকর কাহিনী

নিখিলেশ সেন

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

অগস্ট
১৯৬৫

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার

পরিচয়

রোমাঞ্চকর কাহিনী

১৯৪০ সালের ১৭ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারের বারবেলায় মণ্টু একটা 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার' করে ফেল্‌ল। অবশ্য সে একা নয়, গল্পে যেমন পড়া যায়, তার সঙ্গেও তেমনি দলবল ছিল।

ব্যাপারটা তা'হলে খুলেই বলি। মণ্টু জমিদারের ছেলে; কিন্তু তাই বলে বাপ তার সেকেলে জমিদার নন। বাপের ইচ্ছা, ছেলে গ্রামে না থেকে, শহরে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়। তাই মণ্টু ছেলেবেলা থেকেই কলকাতায় তার এক বিলাত-ফেরং মামার কাছে থেকে লেখাপড়া করে। সেখানে মণ্টুর বন্ধু আর সহপাঠী হচ্ছে তার মামাতো ভাই নরেশ। দু'জনে একসঙ্গেই থাকে বেশ আনন্দেই।

এবারে পূজোর ছুটিতে মণ্টু যখন বাড়ী এলো, তখন তার সঙ্গে এলো তার মামাতো ভাই নরেশ। নরেশ জীবনে কখনো গ্রাম দেখে নাই; তা ছাড়া, সে শুনেছে, মণ্টুদের বাড়ীতে খুব ধুমধাম করে পূজো হয়। একসঙ্গে গ্রামও দেখা হবে, পূজোর আনন্দটাও বেশ ভোগ করা যাবে—এই ভেবে তার আগমন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে হৈ-চৈ, হুল্লোড়, আর হল্লা-হাসির মধ্যে ছুটিটা কেটে গেল। পূজোর সময় গ্রামে যে কি আনন্দ, নরেশ সে-টা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারল। দিন-রাত যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা ভালোভাবে টেরই পাওয়া গেল না! শুধু আনন্দ, আনন্দ আর আনন্দ! নরেশ মনে মনে স্থির করে ফেল্‌ল, প্রতি বছর পূজোতেই সে পিসিমার বাড়ী বেড়াতে আসবে।

যাক্, এইভাবে ছুটিতো ফুরিয়ে এলো। কলকাতা ফিরবার আগের দিন—নরু অর্থাৎ নরেশ, মণ্টুকে বললে—"আমার একটা পাখীর ছানার দরকার। কলকাতায় নিয়ে যাব। দেবে একটা যোগাড় করে? যে-কোন পাখীর বাচ্চা হলেই চল্‌বে।"

প্রস্তাব করা মাত্র মণ্টু রাজি। তাই দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর নরুকে নিয়ে সে চুপি চুপি খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গোবিন্দের কাছে যেতে হবে, কারণ এসব বিষয়ে গোবিন্দই হচ্ছে ওস্তাদ। গাছে উঠ্‌তে, পাখীর ছানা পাড়তে, নৌকো বাইতে, মাছ ধরতে—সে একেবারে চৌকস্! তার সাহায্য পেলে সুন্দর একটি পাখীর ছানা অতি সহজেই পাওয়া যাবে।

খানিক দূরেই গোবিন্দর সন্ধান পাওয়া গেল। পাড়ার মধ্যেই—এই মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পরেই—তার সঙ্গে দেখা।

গোবিন্দ তখন এক অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপারের সম্মুখীন হয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, কি করা উচিত! মার্ব্বেল খেলছিল সে— 'গাব্বুগুচ্চুর' মত একটা দুরূহ খেলা। ইতিমধ্যে যে ক'টি মার্ব্বেল তার ছিল, তা সবই গচ্চা গেছে, এবং শেষদান যেটি সে খেলছিল তাতে ভীষণ একটা সমস্যার সম্মুখীন তাকে হ'তে হয়েছিল—ঠিকমত মারতে পারলে পূরো দানটি পাওয়া যাবে, কিন্তু একটু-আধটু বেঠিক হ'লে পূরো দানটি বেহাত হয়ে যাবার কথা; অথচ অপেক্ষা করলে, ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেও পারে, নাও পারে।

"গোবিন্দ!"—এমন সময় মণ্টুর ডাক শুনে সে বিরক্ত হয়ে উঠল।

"কি, আমার কাছে গুলি নেই, আমি দিতে পারব না",— একটু রাগের সঙ্গেই সে বললে।

"নারে, গুলি চাই না",—মণ্টু বললে,—"শোন না, একটা ভয়ানক দরকারী কথা। আমার কাছে অনেক গুলি আছে, তোকে দেব'খন!"

গুলির লোভে গোবিন্দ উৎফুল্ল হয়ে উঠল, আর মণ্টুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মণ্টু তখন আস্তে আস্তে মনের ভাবটা তার কাছে ব্যক্ত করলে।

গোবিন্দর উৎসাহও কারুর চেয়ে কম নয়। সেও তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। তিনজনে তখন বেরোল 'এ্যাডভেঞ্চার' করতে।

গ্রামের শেষ দিকে একটা খালের ধারে আছে একটা মস্ত পোড়ো বাগান। গোবিন্দ জানত সেই বাগানে একটা গাছে পাখীর বাসা আছে।

তিনজনে মহা উৎসাহে চলল সেই বাগানটার দিকে—আজ একটা পাখীর ছানা তারা আনবেই। নরু সেটাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পুষবে,—তার আর আনন্দের সীমা নাই!

কিছুক্ষণ পরই তারা হাজির সেই বাগানটার কাছে। বাগানটি যে বহুদিনের পুরোণো, তা দেখলে বেশ টের পাওয়া যায়। বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছে ভর্ত্তি, আগাছার জঙ্গলও কম নেই। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা অতি পুরোণো পাকা-বাড়ী।

নরু বললে—"বাপ্‌রে বাপ্, এটা কি আবার একটা বাগান নাকি? এ যে সুন্দরবন! পাখীর ছানা পাড়তে এসে আবার বাঘের মুখে না পড়ি!"

গোবিন্দ উত্তর দিল—"এটা এখানকার পুরোণো জমিদার 'রায়-বাবুদের' বাগান। এখন তাঁদের বংশে কেউ আর বেঁচে নেই বলে বাগানটির এই দুর্দ্দশা! এক সময়ে এই বাগানটি ছিল চ-ম-ৎ-কার ফলে ফুলে ভর্ত্তি।"

নরু বললে—"বাপ্‌স্, ঢুকতেই যে ভয় করছে।—"

মণ্টু তাকে ঠাট্টা করে বললে—"তুই একদম্ শহুরে ফতো-বাবু হয়ে পড়েছিস্ নরু! কথায় কথায় তোর ভয়! এতো

আর সত্যি জঙ্গল নয় যে, বাঘ-ভালুক থাক্‌বে! একটা পুরোণো বাগান মাত্র,—কিচ্ছু ভয়ের কারণ নেই।”

বাগানটির চারিধার উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিছু দূর এগোবার পর তাদের নজরে পড়ল, এক জায়গায় পাঁচিলের গায়ে কয়েকখানা ইঁট খুলে গেছে,—জায়গাটা ভেঙে গেছে। একজনের পর একজন করে তিনজনই সেখান দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুক্‌ল।

গোবিন্দ আরও অনেকবার এই বাগানে ঢুকেছে দলবল নিয়ে, কাঁচামিঠে আমের লোভে। একটা গাছে এখনো যথেষ্ট আম হয়। সে খবর গ্রামের ছেলেরা অনেকেই জানে।

বাগানের ভিতরটা বাস্তবিকই জঙ্গলে ভর্ত্তি। জায়গায়-জায়গায় কাঁটা-ঝোপ আর কচুগাছের বন। চোরকাঁটারও অভাব নেই। বাগানের মধ্য দিয়ে পথ-চলা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার!

তবু গোবিন্দ পথ চেনে। সে আগে আগে চল্‌তে লাগ্‌ল, পিছনে চলল মণ্টু আর নরু।

সামনেই সেই পোড়ো বাড়ীটা। পাকা উঁচু দালান, ভেঙে-চুরে গেছে। দেওয়ালে বড় বড় ফাটল, সেই ফাটলে আবার ঘাস আর গাছ গজিয়েছে। দরজা-জানালাগুলি বন্ধ।

নরু বললে, “বাপরে, এ যে ভূতের বাড়ী দেখ্‌ছি! গুণ্ডার আড্ডাও হ’তে পারে—”

মণ্টু বললে, "নরুটা রাম-ভীতু—"

গোবিন্দ বললে, "এই বাড়ীতে আমরা কতদিন এসে লুকোচুরি খেলেছি,—ভূতের সঙ্গে একদিনও দেখা হয় নাই। তবে একবার কতকগুলি দুষ্টু লোক বদ্ মত্লবে এখানে এসে আড্ডা গেড়েছিল। সেবারে এ-অঞ্চলে লুটপাট, চুরি-ডাকাতি হয়। শেষে পুলিশ এসে এইখান থেকে দল্‌কে-দল গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এই যে, সামনের উঁচু বটগাছটাতে শালিক পাখীর বাসা আছে।" বলে গোবিন্দ এক জায়গায় এসে থাম্‌ল, তারপর বললে, "তোরা একটু নীচে অপেক্ষা কর, আমি গাছে উঠে ছানা পেড়ে আন্‌ছি।"

গোবিন্দ বেশ ওস্তাদের মত তর্‌-তর্‌ করে গাছ বেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল,—মণ্টু বললে, "নরু, ততক্ষণ আয় আমরা এই বারান্দাটাতে গিয়ে বসি।"

সেই পোড়ো বাড়ীটার বারান্দায় দু'জনে গিয়ে বস্‌ল।

বাগানে যে কত রকমের গাছ আছে, তার আর যেন সীমা-সংখ্যা নেই! কোনটা যে কি গাছ, নরু তা চেনে না; তবে নানা রকম ফলের গাছ যে সেগুলি, সে বিষয়ে তার আর কোনো সন্দেহ ছিল না। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে গাছগুলোর উপর জট্‌লা করছিল,—তাদের কল-গানে সমস্ত বাগানখানি মুখরিত। কাছেই একটা ঝোপের ধারে দু'চারটে বেগ্‌নে ফুলের উপর হল্‌দে রঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। ভারি

ভালো লাগ্‌ছিল নরুর! শহরে তো আর এ-সব জিনিষ নজরে পড়ে না! একমনে নরু চারিধারের দৃশ্য দেখ্‌ছিল—হঠাৎ সে চম্‌কে উঠল মণ্টুর একটা ধাক্কা খেয়ে। মণ্টু ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "ঐ শোন্‌ নরু—"

নরু অবাক্‌ হয়ে উত্তর দিল, "কি শুনব?" বলেই সে খানিকটা কাণ পেতে তখনই আবার বললে—"হ্যাঁ, ঐ যে দূরে একটা পাখীর ডাক?—ওটা বোধ হয়—"

"আরে না না, পাখীর ডাক নয়", চাপা-গলায় মণ্টু বললে, "ছোট ছেলের কান্না!"

কাণ খাড়া করে নরু আবার শুন্‌ল, হ্যাঁ, সত্যিই অস্পষ্ট একটা আওয়াজ আস্‌ছে! কে যেন কাঁদছে, "মা-মা" বলে! বড়ই করুণ স্বর, ছোট ছেলের গলা।

গম্ভীর ভাবে কী চিন্তা করে মণ্টু বললে, "এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি নরু! ভালো করে লক্ষ্য করে শোন, কান্নাটা আস্‌ছে এই পোড়ো বাড়ীটার একটা ঘরের ভিতর থেকে। তা' হলে নিশ্চয়ই—"

মণ্টু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, তারপর বললে, "একটু আগেই গোবিন্দ বলেছে, এই বাড়ীটাতে কতকগুলি ডাকাত আড্ডা গেড়েছিল;—আমার মনে হয়, এখনো তাদের কেউ-কেউ এ-বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছে, আর এ-অঞ্চলের কোনো ছেলেকে চুরি করে এনে আট্‌কে রেখেছে—।"

আবার সেই ক্ষীণ করুণ "মা-মা" শব্দ ! এবার যেন শব্দটা অত স্পষ্ট নয়,—ছেলেটি যেন ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে !

নরু ভয় পেয়ে বললে, "তা' হলে উপায় ? চল তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ী গিয়ে খবর দেই। কার ছেলে চুরি গেছে টের পাওয়া যাবে, আর পলিশ দিয়ে ডাকাতদের গ্রেপ্তার করা যাবে।"

"উঁহু, দেরী করলে চল্‌বে না"—মণ্টু দৃঢ় স্বরে বললে—"ছেলেটিকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে।"

বল্‌তে বল্‌তে গোবিন্দও সেখানে এসে হাজির,—হাতে তার ছোট একটি শালিক পাখীর ছানা চিঁ চিঁ করছে।

অন্য সময় হ'লে, ছানাটিকে দেখে নরু আর মণ্টু দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা হ'ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ! কিন্তু এই আকস্মিক রোমাঞ্চকর ঘটনায় তাদের মন বিশেষ চঞ্চল হ'য়েই ছিল। মণ্টু গোবিন্দকে সমস্ত কথা খুলে বললে।

আর একবার শোনা গেল—অতি মৃদু—অতি অস্পষ্ট আওয়াজ—"মা—"

শব্দটা আস্‌ছে,—বারান্দার পূব দিকের একটি ছোট কুঠ্‌রি থেকে।

মণ্টু উত্তেজিত হয়ে বললে, "না, আর দেরী নয়, ডাকাতগুলো হয়ত এখন এখানে নাই,—কারণ কারুর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ; এই সুযোগে আমরা বিপন্ন ছেলেটিকে উদ্ধার করি।"

আর সময় নষ্ট না করে তিনজনে হাজির হ'ল সেই কুঠ্‌রিটার

ধারে। মনে হ'ল, কে যেন ভিতর থেকে দরজাটা খুলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

মণ্টু বললে, "এই ছাখো, বাইরের থেকে নীচের ছিটকিনিটা আটকে দেওয়া হয়েছে, যাতে ছেলেটি না পালাতে পারে!" এই বল্‌তে বল্‌তে সে মর্‌চে-ধরা ছিট্‌কিনিটা টেনে খুলে ফেলল। দরজাটা খোলামাত্র প্রকাণ্ড একটা রামছাগল মণ্টুকে ধাক্কা দিয়ে ঢু মেরে মাটিতে ফেলে 'ম্যা-ম্যা—গর্‌র্‌-গর্‌র্‌' করতে-করতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

* * * *

এ্যাড্‌ভেঞ্চার শেষ করে বাড়ীর দিকে ফিরতে ফিরতে মণ্টু বললে, "রামছাগলটা আমাদের আচ্ছা বোকা বানিয়েছে!"

নরু প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, ছাগলটা ঐ ভাবে ঘরে বন্দী হ'ল কি করে?"

গোবিন্দ বললে, "আরে এটাতো অতি সোজা কথা! রামছাগলটা হয়ত কোনো কারণে ঘরে ঢুকে পড়েছিল, সেই সময় হয়ত বাতাসের ঝাপটায় দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, বাইরের ছিট্‌কিনিটাও সঙ্গে সঙ্গে আট্‌কে যায়, আর বাছাধন বন্দী হয়ে পড়েন।"

মণ্টু বললে, "যাক্‌, একটা জীবকে তো বিপদ থেকে উদ্ধার করা গেল!"

সালটা আমার ঠিক মনে নেই। তবে বোধ হয় ১৯১৬ কি '১৭ সাল। সে সময়ে সোমড়া হাই-স্কুলে অত্যন্ত হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কারণ, সে সময় মণিবাবু নামে এক ভীষণ রাগী ও বদ্‌মেজাজি মাষ্টার সেই স্কুলে চাকরি নেন, এবং নরেন নামে এক অত্যন্ত ডানপিটে ছেলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত।

স্কুলের সমস্ত ছেলে ভয় করত মণিবাবুকে, আর সমস্ত মাষ্টার ভয় করতেন নরেনকে। কেবল দুটি প্রাণী দুটি প্রাণীকে ভয় করত

না—মণিবাবু ভয় করতেন না নরেনকে, আর নরেন ভয় করত না মণিবাবুকে! সুতরাং এ দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, এবং হ'লও তাই। মণিবাবু ও নরেনের মধ্যে এক তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হ'ল, এবং তারই ফলে অবশেষে নরেনকেই স্কুল ছেড়ে পালাতে হ'ল। সেই কাহিনীই বলছি।

সেই সময়ে তৃতীয় শ্রেণীতে নরেনের সঙ্গে মণি নামে একটি ছেলে পড়ত, আর মণিবাবু নামে একজন মাষ্টারও ছিলেন সেই স্কুলে। একদিন মণিমাষ্টার যখন ক্লাসে এলেন, তখন নরেন চেঁচিয়ে উঠল তার সহপাঠী মণিকে লক্ষ্য করে, "একটি চড়ে তোমার দাঁত ক'পাটি উড়িয়ে দেব মণি!"

কথাটা শুনে মণিবাবু ভাব্‌লেন, তাঁকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হয়েছে। তিনি গেলেন ভীষণ রকম চটে! তারপর গর্জ্জন করে বলে উঠলেন নরেনকে লক্ষ্য করে—"কে হে বে-আদব ছোক্‌রা, অসভ্য বর্ব্বর কোথাকার—"

নির্লিপ্তের মত দাঁড়িয়ে উঠে বেশ সহজভাবেই নরেন বললে, "আমায় বলছেন, স্যার?"

"হাঁ, হাঁ, তোমাকেই বলছি, ক্লাসের মধ্যে ও-রকম অসভ্যের মত চেঁচাচ্ছিলে কেন?" মণিবাবু বলে উঠলেন।

"কেন বলব না স্যার? মণি আমার বইয়ে হাত দিয়েছে। সাজানো বইগুলো ঘেঁটে দিয়েছে। আমি আর একদিন ওকে বারণ করেছিলাম—"

তার কথা শেষ হবার আগেই মণিবাবু প্রশ্ন করিলেন—"মণি কার নাম ?"

নরেনের সহপাঠী মণি মাথা নীচু করে উঠে দাঁড়াল।

"তুমি ? ও, তা তুমি ওর বইগুলো ঘেঁটে দিয়েছ কেন ?"

"ইংরেজীর মানে-বইটা একবার নিয়েছিলাম স্যার",—মণি আস্তে আস্তে বললে।

"একবার নিয়েছিলাম, স্যার ?"—তাকে ভেঙ্‌চে নরেন বললে, "বইগুলো যেন তোমারই নিজের যে যখন ইচ্ছে তখন নেবে! আমাকে না বলে তুমি আমার বইয়ে হাত দাও কেন ?"

এ কথার ওপর আর কথা চলে না। বাধ্য হয়েই মণিকে বল্‌তে হ'ল,—"অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা চাইছি।"

"ক্ষমা আমি তোমায় অনেকক্ষণ আগেই করেছি",—নরেন বললে,—"না হ'লে তখুনি আমি তোমায় শিক্ষা দিয়ে দিতাম।"

মণিবাবু এবার আর সহ্য করতে পারলেন না। নরেনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—"তুমি আমার কাছে উঠে এস ত!"

নরেন ভাল-মানুষের মত আস্তে আস্তে মণিবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মণিবাবু বললেন,—"আমি ক্লাসে থাকতে তুমি ও-রকম ভাবে চেঁচিয়ে কথা বললে কেন ? তুমি ত আমার কাছে নালিশ করতে পারতে। কিন্তু তুমি তা করলে না। আমি গোড়া
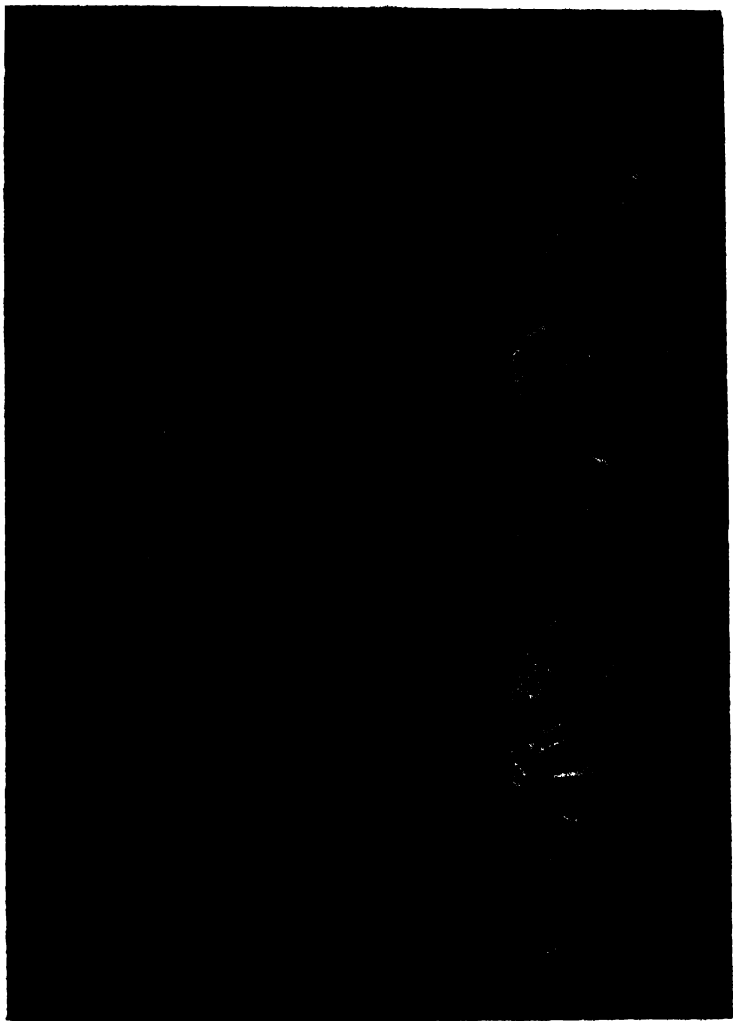
হরেন দেখলে, একটা লোক তাদের বাগানের দিকে যাচ্ছে, কাঁধে রমদার দামী প্যাণ্টটা রয়েছে।

থেকেই লক্ষ্য করছি যে, ক্লাসে গোলমাল করাই তোমার মতলব।"

"এসব ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে যদি মাষ্টারদের কাছে নালিশ করতে হয়, তাহলে ত অত্যন্ত লজ্জার কথা। এসব ব্যাপার ত নিজেদের মধ্যেই মিটমাট করে নিতে হবে,"—নরেন গম্ভীরভাবে বললে।

মণিবাবু বুঝলেন যে, এই ভাল-মানুষ ছেলেটি বড় সোজা 'চীজ্' নয়। তিনি বললেন,—"তুমি যখন এতটা বোঝ তখন তোমার এটাও বোঝা উচিত ছিল যে, ক্লাসে গোলমাল করাটা সঙ্গত নয়। এর জন্যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব!"

"শাস্তি আপনি যদি দেন ত আমি মাথা পেতে নেব, স্যার! কিন্তু দেখবেন, শাস্তি যেন কমবেশী না হয়। বিচার করে যেটুকু আমার পাওনা, সেটুকু শাস্তিই আমায় দেবেন,"—নরেন বললে।

কথাটা শুনে রাগে মণিবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন,—"এখনও আমার সঙ্গে ইয়ারকি করতে তোমার লজ্জা করছে না? যাও, দরজার বাইরে গিয়ে চেয়ার হও গে।"

"চেয়ার হবার মত কাজ ত আমি করিনি, স্যার!"

"কোন কথা আমি শুনতে চাই না, তোমায় আমি বাইরে চেয়ার হ'তে বলেছি, তুমি চেয়ার হবে কি না?"

নরেন আর কোন কথা না বলে, বাইরে গিয়ে চেয়ার হ'ল।

তাঁর ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। নরেনও সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে ঢুকল। রাগে তার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে।

ক্লাসের বেশীর ভাগ ছেলে ভিড় করে দাঁড়াল তার চারদিকে। সে বলতে লাগল,—"এর প্রতিশোধ আমি নেব, তবে ছাড়ব। যদি প্রতিশোধ না নিতে পারি ত' আমার নাম নরেন নয়।"

কতকগুলো বদ ছেলে তার কথায় সায় দিয়ে বললে,—"ঠিক, উনি তোমাকে ও-রকম ভাবে অপমান করলেন আর তুমি অমনি ছেড়ে দেবে! কখনই না।"

সেদিন সারা দিনটাই গোলমালে শেষ হ'ল।

পরদিন নরেন একটু আগে থেকেই স্কুলে এল। তার পকেটে কতকগুলো আস্ত সুপুরি। তখনও অন্য কোন ছেলে ক্লাসে আসেনি। সে সুপুরিগুলো চেয়ারের পায়ের তলায় রেখে দিলে, যাতে একটু চাপ পড়লে চেয়ারটা উল্টে যেতে পারে।

ফার্স্ট পিরিয়ডেই মণিবাবুর ক্লাস। তিনি ক্লাসে ঢুকতেই ছেলেরা উঠে দাঁড়াল। নরেনও ভাল-মানুষের মত তাদের অনুকরণ করলে। মণিবাবু খানিকক্ষণ সৎ-স্বভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে, বসতে গেলেন।

চেয়ারে বসা-মাত্র চেয়ার হড়কে কাত্ হয়ে গেল, এবং সামলাতে গিয়ে গেল উল্টে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়ে গেলেন।

প্রথমে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা তুলতে গিয়ে চেয়ারের পায়ের কাছে চারটে সুপুরি পড়ে থাকতে দেখে, এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন,—"শীগ্‌গির বল, তোমাদের মধ্যে কে এই মারাত্মক কাজটি করেছে!"

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ, যেন ভয়ে ছম্‌ছম্ করছে—এখুনি কি না কি ঘটে! কেউ তাঁর কথার উত্তর দিলে না।

আবার তিনি চীৎকার করে উঠলেন,—"এখনও বলছি, কে এ কাজ করেছে বল, তা না হলে আমি ক্লাসের সমস্ত ছেলেকে বেত মারব। তাতেও যদি না হয় ত সকলকে দশ টাকা করে ফাইন্ করে দেব।"

কিন্তু তবুও কেউ কোনও কথা বললে না।

"তোমরা বলবে না? বেশ, দেখছি আমি কি করতে হয়"—বলে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি যখন আবার ক্লাসে ঢুকলেন তখন তাঁর হাতে একগাছা বেত।

"এই শেষবারের মত আমি তোমাদের অনুরোধ করছি অপরাধীর নাম বলবার জন্য।"—বলে তিনি টেবিলের ওপর বেতটা বার-কয়েক আছড়ালেন।

বেত দেখেই কতকগুলো ছেলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এবং তার শব্দ শুনে আরও কয়েকজন ভয় পেয়ে গেল। তাদেরই মধ্যে একজন ভয়ে ভয়ে বললে,—"নরেন করেছে, স্যার!"

এই ছেলেটি অন্যান্য ছেলের চেয়ে আগে ক্লাসে এসেছিল এবং চেয়ারে বস্‌তে গিয়েছিল। তখন নরেন তাকে সুপুরি সম্বন্ধে সাবধান করে দেয় এবং সে যে প্রতিশোধ নেবার জন্যেই এটা করেছে, তাও সে বলে।

নরেন এ কাজ করেছে শুনে মণিবাবুর রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন,—"আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, একমাত্র নরেন ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে সাহস করবে না।—ওসব ছেলেকে কি করে শায়েস্তা করতে হয়, তা আমার বেশ ভালভাবেই জানা আছে! এর আগে ওর মত আরও অনেক বদমায়েস ছেলেকে আমি ঠাণ্ডা করেছি।"

তারপর রাগে আত্মহারা হয়ে তিনি বেত চালালেন নরেনের পিঠে মুখে গায়ে।

কিন্তু আশ্চর্য্য নরেনের সহ্যশক্তি! সে যন্ত্রণায় একবার "উঃ আঃ" পর্য্যন্ত করলে না! পিরিয়ড শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন সে বাড়ী চলে গেল।

ব্যাপারটা নিয়ে সারা স্কুলে খুব হৈ চৈ পড়ে গেল।

সেদিন বিকালবেলা যখন মণিবাবু স্কুল থেকে বাড়ী ফির-

ছিলেন, তখন দেখলেন, একটা নির্জ্জন মোড়ের মাথায় নরেন একটা মোটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখ-চোখ লাল, বাঁ-গালের উপর একটা সুদীর্ঘ লাল দাগ ফুলে উচু হয়ে তার প্রহারের গুরুত্ব প্রমাণ করছে। এ ধরণের আরও অনেকগুলো দাগ হয়ত তার গায়ে খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু জামা এবং কাপড়ে তা ঢাকা ছিল।

তাকে ওই অবস্থায় দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিতে মণিবাবুর কিছুমাত্র দেরী হ'ল না। তিনি রাস্তার মাঝে থমকে দাঁড়ালেন। আর এগুনো উচিত কি না ভাবছিলেন, এমন সময় নরেনই তার সামনে এগিয়ে এল।

তাকে এগুতে দেখে মণিবাবু অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু মুখে যাতে সে ভাবটা প্রকাশ হয়ে না পড়ে, তার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নরেন বললে,—"কি, মুখ শুকিয়ে গেল কেন? ভয় পেয়েছেন বুঝি? কেন, লাগবে? বেত মারার আগে এ কথা আপনার ভাবা উচিত ছিল।...বেত মারার ফলটা একবার দেখুন না"—বলে মণিবাবুর পায়ে লাঠির বাড়ি এক ঘা মেরেই সে ছুটে পালাল। মণিবাবুও চীৎকার করে সেখানে বসে পড়লেন।

চীৎকার শুনে লোক জমে গেল। তারা তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ী পৌঁছে দিলে! ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার

পরীক্ষা করে দেখে বললেন যে, "পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে; সারতে অন্ততঃ পূরো একমাস লাগবে।"

নরেন এদিকে এক ছুটে বাড়ী পৌঁছে গেল। কিন্তু সেখানেও তার ভয় কম্‌ল না। কারণ সে বেশ বুঝতে পারলে যে, শীঘ্রই খবরটা তাদের বাড়ীতে পৌঁছুবে; আর তার বাবা যখন এ-কথা শুনবেন, তখন তার পিঠের চামড়া আর আস্ত থাকবে না।

নরেনের তখন আর রাগ নেই। সে বুঝতে পারলে কি ভয়ঙ্কর কাজ সে করেছে! তাছাড়া তার বাবাকেও সে বিলক্ষণ ভয় করে। এ কাজ করবার পর বাবার সামনে দাঁড়াবার কথা চিন্তা করেই সে শিউরে উঠ্‌ল। কিন্তু কি করা উচিত, তা সে টপ্‌ করে ঠিক করতে পারলে না। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে বাড়ী থেকে পালানোই ঠিক করে ফেললে।

তারপর মায়ের বাক্স থেকে লুকিয়ে কয়েকটা টাকা বার করে নিয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তার বাবা রাত্রে বাড়ী ফিরে যখন শুনলেন যে, নরেন মণিবাবুকে মেরেছে এবং তারপর থেকেই তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তিনি গম্ভীরভাবে শুধু বললেন,—"ও-রকম ছেলের মরাই ভাল। সে নিশ্চয়ই এখান থেকে পালিয়েছে। পালিয়েছে, ভালই হয়েছে; তা নাহ'লে আমিই তাকে মেরে বাড়ী থেকে বার করে দিতাম।"

নরেনের মা তার খোঁজ নিতে বলে বিফলমনোরথ হলেন।

তার বাবা তার সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখতে চান না। সুতরাং তার মাকে কেঁদেই ক্ষান্ত হ'তে হ'ল।

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। এক জনের পর একজন করে সে মড়ার সকলেই প্রায় নরেনের কথা ভুলে যেতে লাগল; কারণ নরেনের কথা মনে করে রাখায় তাদের কোন স্বার্থ ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে ছেলেমহলে ডানপিটেমি ও গুণ্ডামির কথা উঠলে হঠাৎ কারও কারও তার কথা মনে পড়ে যেত। কিন্তু সে বেঁচে রইল কি মরে গেল, সে খবরও কেউ রাখত না। তার বাবাও আর তার কোন খোঁজখবর করেননি। কেবল তার মা, কারণে অকারণে হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যাওয়ায়, গোপনে চোখের জল ফেলতেন। কিন্তু সে কথা বাইরের কেউ জানতে পারত না। লোকে ভাব্‌ত যে, তিনি ছেলের কথা ভুলে মন বেঁধেছেন।

এমনি করে সময় বেশ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তের-চৌদ্দ-বছর পরে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

১৯৩০ সাল। ১৬ই মে। সেদিন ছিল সোমড়া হাই-স্কুলের পুরস্কার দিবার দিন। পুরস্কার দিতে আসছিলেন মিঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। তাঁর নামের পিছনে কতকগুলো কি ডিগ্রী ছিল। ভদ্রলোক ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক বিখ্যাত দেশ ঘুরে জ্ঞানসঞ্চয় করে কিছুদিন আগে দেশে ফিরেছেন।

এবারে সভাপতি ঠিক করতে করতে প্রাইজের বড় দেরী হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে খবরের কাগজে বিলেত-ফেরৎ ভদ্রলোকের ছবি দেখে ও তাঁর কৃতিত্বের কথা পড়ে হেডমাষ্টার মশাই এবার এঁকেই সভাপতি করে প্রাইজের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার কথা মনে করলেন।

ক্রমে বিকেল হ'ল। হেডমাষ্টার মশাই সভাপতিকে আনতে গিয়েছিলেন। যথাসময়ে সভাপতি এসে হাজির হলেন। রাস্তায় আসতে আসতে সভাপতি মশাই হেডমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা, মাষ্টার মশাই, আপনাদের স্কুলে মণিবাবু নামে মাষ্টারটি এখনও আছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—হেডমাষ্টার মশাই বললেন।

"দেখুন, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমরা আপনার ছাত্রের মত। সুতরাং আপনি যে আমার সঙ্গে 'আজ্ঞে' বলে কথা বলবেন এটা আমি পছন্দ করি না, বরং আমার সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা বললেই আমি বেশী খুসী হব। সুতরাং···"

হেডমাষ্টার মশাই ভদ্রলোকের অমায়িকতায় বিগলিত হয়ে পড়লেন—আজকালকার বিলেত-ফেরৎ ছেলে, অথচ তার এমন মনোভাব। তিনি বললেন,—"আচ্ছা, আপনি কি করে মণিবাবুর নাম জানলেন ?"

"তা জানব না কেন ?"—সভাপতি বললেন,—"আপনাদের স্কুলের কে একটি ছেলে ওঁকে মেরেছিল না! তারপর থেকেই ত

ওঁর নাম হুগলী জেলার প্রায় সকলেই জেনে গেছে। আর আমার বাড়ীও এই হুগলী জেলায় কিনা !”

“ও, তাই নাকি !”—হেডমাষ্টার মশাই বললেন,—“কোথায় আপনার বাড়ী ?”

সে কথার উত্তর না দিয়ে সভাপতি বললেন,—“আচ্ছা, আপনাদের স্কুলের পুরোণো মাষ্টার মশাইরা বোধ হয় সকলেই আছেন, না ?”

“হ্যাঁ, দু’ একজন ছাড়া সকলেই আছেন”—হেডমাষ্টার মশাই বললেন।

“পরিচয় দিলে আমাকে তাঁরা সকলেই বোধ হয় চিনতে পারবেন।···চলুন, স্কুল এসে গেছে”,—সভাপতি বললেন।

বাস্তবিকই স্কুল এসে গিয়েছিল। সুতরাং তখন সভাপতির সঙ্গে হেডমাষ্টার মহাশয়ের আর কোন কথা হ’ল না।

স্কুলের সামনে কয়েকজন মাষ্টার ও স্কুলের সেক্রেটারী সভাপতিকে সম্বর্দ্ধনা করলেন। একদল ছাত্র কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সভাপতি সকলের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন এবং সেক্রেটারী ও মাষ্টার মশাইদের নমস্কার করলেন।

পুরস্কার বিতরণের কাজ আরম্ভ হ’ল। অন্যান্য ছোট-খাট কাজ শেষ হবার পর সভাপতি কিছু বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। সভাপতি বলতে লাগলেন—

······“ছাত্র বন্ধুরা, বেশী কিছু বলে আমি সময় নষ্ট করব না,

কারণ আমি বুঝতে পারছি যে, তোমাদের মধ্যে যারা পুরস্কার পাবে, তারা প্রাইজ দিতে দেরী হওয়ার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।......জীবনে ভুল করারও প্রয়োজন আছে। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে, একটা ভুলের জন্যে কোন কোন লোকের জীবনের গতি একেবারে পাল্টে গেছে—যেমন ধর, কোন দুষ্টু ছেলে হয়ত একবার ভুল করে একটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে ফেললে, এবং পরে সে তার অন্যায় বুঝতে পারলে। বুঝতে পেরে তার মনে অনুতাপ হ'ল, এবং তারপর থেকে ভাল হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল এবং ফলে ভাল হ'লও। সুতরাং যদি কেউ অন্যায় করে, তাকে তখুনি গুরুতর শাস্তি না দিয়ে, তাকে তার ভুল বোঝাবার জন্যে সময় দিতে হবে। সে যদি তার ভুল বুঝে নিজেকে সংশোধন করে নেয় ত ভালই; কিন্তু ভুল বোঝা সত্ত্বেও যদি পরে সে আবার অন্যায় করে, তা'হলে তখন তাকে শাস্তি দিতে হবে; কারণ তখন বুঝতে হবে যে, অন্যায় করাই তার স্বভাব। তখন তাকে শোধরাবার জন্যে, যাতে সে পরে আর অন্যায় না করে, শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু তাব'লে তোমরা মনে ক'র না যে, আমি তোমাদের ইচ্ছে করে অন্যায় করবার জন্যে উপদেশ দিচ্ছি। তা নয়। আমি সেই সব অন্যায়ের কথাই বলছি, যা মানুষ হঠাৎ উত্তেজনা বা রাগের মাথায় করে বসে। এই সব ক্ষেত্রে উত্তেজনা বা রাগ কমবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে।"...

আরও দু'একটা সাধারণ কথা বলে সভাপতি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তারপর তিনি ছেলেদের পুরস্কারগুলো দিয়ে দিলেন। তারপর সামান্য জলযোগের জন্যে তাঁকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। খাবার সাজানোই ছিল। তাঁকে খাবার জন্যে সকলে অনুরোধ করলেন। কিন্তু খাবার না খেয়ে তিনি বললেন,—"আমি ত এখন খেতে পারি না। আমার একটা মস্ত-বড় কাজ এখনও বাকি রয়েছে।"

বলে তিনি হেডমাষ্টার মশাইয়ের পায়ের কাছে বসে পড়লেন, এবং তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলেন। বললেন —"আপনি আমাকে চিনতে পারেননি স্যার? আমি আপনাদের সেই দুষ্টু ছাত্র—নরেন।"

"নরেন, আপনি নরেন, তুমি আমাদের নরেন।"—হেডমাষ্টার মশাই প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন।

"হ্যাঁ স্যার, আমি আপনাদেরই নরেন। আমি আজ এসেছি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে। আমি আজ বুঝতে পেরেছি কত অন্যায় কাজ আমি সেদিন করেছিলাম! আমি আজ অনুতপ্ত";—বলে সভাপতি মণিবাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন।—

"আপনি আমাকে ক্ষমা করুন স্যার,"—এই বলে হঠাৎ তিনি মণিবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়লেন।

"আহা হা, করছ কি, করছ কি!"—মণিবাবু ব্যস্ত হয়ে সরে

গেলেন। তারপর সভাপতিকে হাত ধরে তুলে বললেন, "ক্ষমা আমি তোমায় অনেকদিন আগেই করেছি নরেন! তোমার এখান থেকে পালাবার খবর পাবার পর থেকেই আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলাম। কারণ, নির্জ্জনে ব্যাপারটা চিন্তা করার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ভুল তুমি করেছিলে বটে, কিন্তু তোমার সে ভুলের জন্যে আমিও কম দায়ী ছিলাম না! আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, মার-বকুনি বা ভয় দেখিয়ে ছেলেদের মন জয় করা যায় না; তাদের মন জয় করতে হয় দয়া-মায়া ও স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে। যে ভুল করার জন্যে তোমার জীবনে এত-বড় একটা পরিবর্ত্তন এসেছে, সেই ভুলের জন্যে আমারও মনের একটা মস্ত-বড় ভুল ধারণার পরিবর্ত্তন হয়েছিল। তোমাকে যেদিন আমি মনে মনে ক্ষমা করেছিলাম, সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল যে, জগতে তুমি উন্নতি করতে পারবে। আমার আজ সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমার সে ধারণা সত্য হয়েছে, তুমি মানুষ হ'তে পেরেছ। আমার মনে আজ গর্ব্ব হচ্ছে এই ভেবে যে, আমি তোমাকে একেবারের বেশী ভুল বুঝিনি।"

তিনি থামলে হেডমাষ্টার মশাই বললেন,—"সত্যি আজ আমরা গর্ব্ব করতে পারি নরেন, যে, আমাদেরই ছাত্র হয়ে তুমি আজ এত-বড় মানুষ হয়েছ। যাক্, ওসব কথা এখন থাক। সামান্য কিছু খেয়ে তুমি আমাদের তোমার বাইরের জীবনের

কথা বল। এখান থেকে চলে যাবার পর থেকে ত' আমরা তোমার আর কোন খবরই পাইনি !"

"হ্যাঁ, তাই বরং বলি",—সভাপতি বলতে লাগলেন,—"বাড়ী থেকে সোজা আমি ষ্টেশনে চলে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম হাওড়া। সঙ্গে যা টাকা ছিল, তা দিয়ে আমি একটা লক্ষ্ণৌএর টিকিট কাটলাম। এত জায়গা থাকতে, লক্ষ্ণৌএর টিকিট আমি কেন কাটলাম, তা আমি নিজেই জানি না। ট্রেণ ছাড়তে তখনও দেরী ছিল। ট্রেণে বসে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া ভাবছিলাম। ভাবতে-ভাবতে আমার মনে অনুতাপ এল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যেমন করেই হোক, আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্যে চেষ্টা করব, এবং যদি মানুষ হ'তে পরি তবেই আবার দেশে ফিরব !......

গাড়ীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমার মুখ-চোখের ভাব তখন এমন হয়েছিল যে, আমার মুখের দিকে ভাল করে তাকালে যে-কেউ বুঝতে পারত যে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে।

ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'বাবা, তুমি কোথা যাবে ?'

আমি বললাম,—'এখন ত লক্ষ্ণৌতে যাব বলে মনে করছি।'

তিনি বললেন,—'সেখানে কি তোমার কোন আত্মীয় থাকেন ?'

আমি উত্তর দিলাম—'না।'

'তবে কোথায় থাকবে ?'—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'এখন কিছুই ঠিক নেই'—আমি উত্তর দিলাম।

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন,—'বাবা কিছু মনে কোর না। দেখ, তোমার মুখ দেখে এবং তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, একটা অস্বাভাবিক কিছু করে ফেলে তুমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ।'

আমি সে কথা স্বীকার করলাম, এবং তিনি জানতে চাওয়ায় তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম।

শুনে তিনি বললেন,—'তোমার অন্যায় হয়েছে বাবা! তা এখন আর কি করবে ? ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। তবে সে ভুলকে সময় থাকতে শুধ্‌রে নিতে হবে। তুমি যে কাজ করেছ, তাতে তোমার বাড়ী ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তা তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত' আমি তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারি এবং তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে পারি।'

আমি তাঁর কথায় আনন্দের সঙ্গে রাজী হলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেলাম এবং সেখানে মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলাম।

তাঁর আর কেউ ছিল না। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁরই পয়সায় আমি ইউরোপ পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম। যখন বার্লিনে ছিলাম, তখন খবর পেলাম যে, তাঁর খুব অসুখ। খবর শুনেই আমি দেশে ফেরবার জন্যে যাত্রা করলাম! কিন্তু ফিরে এসে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার আর হ'ল না। তাঁর যা-কিছু ছিল, তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন।"

সভাপতি একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, —"কলকাতায় এসেছিলাম, থাকব বলে। তারপর বাড়ী ফিরব মনে করছিলাম, এমন সময় আপনারা আমাকে এখানে নিয়ে এলেন।......আচ্ছা, আজ তাহ'লে এখন বাড়ী গিয়ে মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করিগে। ইউরোপের জীবনের কথা আপনাদের পরে আর একদিন বলব। নমস্কার!"

বর্ষাকাল।...

কয়দিন থেকেই চলেছে একঘেয়ে একটানা বৃষ্টি, ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্,—থামবার আর নাম নেই! কী বিশ্রী দিন! আমাদের মত ছেলেদের পক্ষে এই বৃষ্টির দিনে ঘরে বন্দী হয়ে থাকাটা মস্ত-বড় শাস্তি-বিশেষ। অথচ না বন্দী হয়ে থেকেই বা উপায় কি? সারা আকাশের মুখ ভার, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন দমে আছে! বাইরে একটু বেরুব, তার আর জো নেই। রাস্তায় জল জমে গেছে, যেখানে জল নেই সেখানে কাদা।
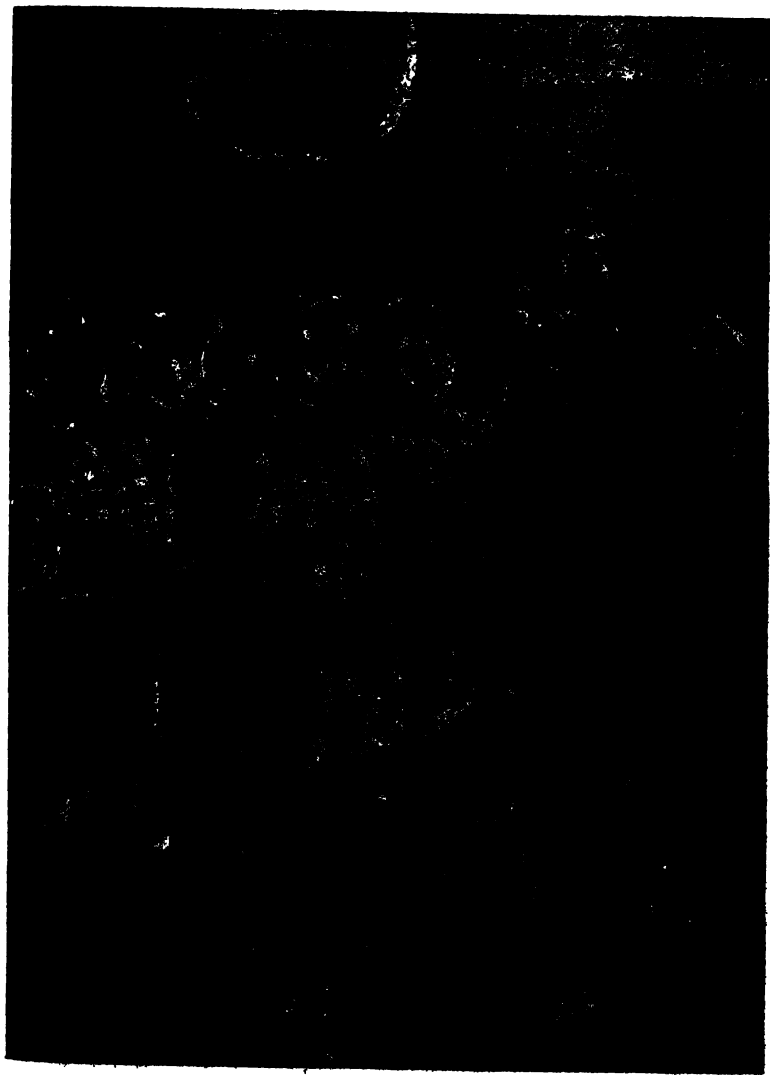
"এই যে ঠাকুর্দা, আসুন, আসুন—"

বিকালের দিকে সেদিন জলটা একটু ধরেছে, অমনি বেরিয়ে পড়লাম জামা-কাপড়ের মায়া ছেড়ে। চললাম লাইব্রেরীর উদ্দেশ্যে একটা বই বদ্‌লে আন্‌তে। এই কয়দিন বৃষ্টির জন্যে আর বইটা বদ্‌লানো হয়নি।

লাইব্রেরীতে নির্ব্বিঘ্নে গিয়েই হাজির হ'লাম, বইও ভালো মতে বদ্‌লানো হ'ল—কিন্তু বইটা নিয়ে দরজার বাইরে যেই পা দিয়েছি, অমনি আরম্ভ হ'ল আবার ঝমাঝম মুষলধারে বৃষ্টি। সারা আকাশটা যেন ঝাঁঝরার মত ফুটো হয়ে জল ঝরতে লাগ্‌ল প্রবল বেগে। অগত্যা কি আর করি, মনের দুঃখ মনেই চেপে লাইব্রেরীর একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম হতাশ হয়ে।

লাইব্রেরী ঘরে তখন আমার মত অনেক ছেলেই জমায়েৎ হয়েছিল। তারাও আপাততঃ বাড়ী যাওয়ার আশা ছেড়ে ঘরের মধ্যেই গুল্‌তানি স্থুরু করে দিলে।

বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল, আর অমনি দেখি আমাদের সরকারী ঠাকুর্দ্দা—পঁচাত্তর বৎসরের শিশু, শ্রীরমেন গাঙ্গুলী, ভিজে ছেঁড়া ছাতাটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন।

"এই যে ঠাকুর্দ্দা, আস্থন, আস্থন,"—অভ্যর্থনার ধুম পড়ে গেল,—"তারপর, কি ব্যাপার ?"

"আর বলিস কেন,"—দু'বার কেশে গলা সাফ করে নিয়ে ঠাকুর্দ্দা বললেন,—"তামাক কিনতে বেরিয়েছিলাম, এমন সময় …হুঁ।"

কথাটা শেষ হ'ল না বটে, কিন্তু "হুঁ" চীজ্‌টি যে কি, লাইব্রেরীতে বসে বসে আমরা সকলেই সেটা বেশ অনুভব করছিলাম।

ছাতাটি দরজার কোণে রেখে ঠাকুর্দ্দা একখানি চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললেন,—"বাঃ, তোদের লাইব্রেরীতে ত' আজকাল অনেক ছেলে হয় দেখছি।"...

আরও খানিকটা কি তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই কতকগুলো ছেলে বলে উঠল,—"ঠাকুর্দ্দা, একটা গল্প!"

ঠাকুর্দ্দার কাছে নাতিদের চিরন্তন দাবী।

কিছুক্ষণ চুপ্ করে থেকে ঠাকুর্দ্দা বললেন,—"কিসের গল্প শুনবি—ভূতের না রাক্ষসের? ডাকাতের না রাজার?"

"ওর কোনটাই নয় ঠাকুর্দ্দা", রতন বললে—"তার চেয়ে একটা সত্য ঘটনা বলুন, যা আপনার জীবনে ঘটেছিল।"

আমরা জানতাম যে, সত্যি ঘটনা বলতে বললে ঠাকুর্দ্দা ভারি মজার সব আজগুলি গল্প বলতেন।

"সত্যি ঘটনা? তবে শোন্"—ঠাকুর্দ্দা আরম্ভ করলেন,—"আমার জীবনে একবার ভারি মজার একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেইটেই তোদের বলি।

তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। একটা চাকরি খুইয়ে আর একটা চাকরির চেষ্টা করছি। অনেক ঘোরাঘুরির পর

অবশেষে খবর পেলাম যে, আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের আপিসে একটা চাকরি খালি হয়েছে। সুতরাং সেইদিন থেকেই আত্মীয়টির উমেদারী সুরু করলাম। খোসামুদিতে খুসী হয়ে অবশেষে সে একদিন আমাকে তাদের আপিসে নিয়ে চল্‌ল।

আমি জানতাম যে, সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে, কথাবার্ত্তায় তাঁকে এমন মুগ্ধ করে দেব যে, খুসী হয়ে সাহেব চাকরি দেবেনই। কাজেই বেশ খুসী মনেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মনে মনে তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি যে, চাকরিটা তাহ'লে পাচ্ছি।

সাহেবের সঙ্গে ত' দেখা করলাম!

সাহেব অনেকদিন বাংলাদেশে ছিলেন, তাই বাংলা ভাষা অনেকটা শিখেছিলেন। তাই কথা কইছিলেন ইংরিজী ও বাংলা মিশিয়ে।

একথা সেকথার পর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমার নাম কি ?'

'নাম',—আমি উত্তর দিলাম—'আমার নাম, রমেন গাঙ্গুলী।'

'তুমি কি বামুন ?'—আবার প্রশ্ন হ'ল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—কথা বলতে বলতে আমি মুখে ও দাঁড়াবার ভঙ্গীতে বেশ সপ্রতিভ ভাব আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে সহজেই সাহেব মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন কিছু ভাবতে লাগ্‌লেন। তারপর বললেন—'তোমার আর্জ্জি কোথায় ?'

সাহেব কি বলতে চাচ্ছেন আমি প্রথমে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ একটা কথা আমার মাথায় খেলে গেল—তাইত, সাহেব কি বাংলা 'আর্জ্জি' কথাটা ব্যবহার করলেন নাকি, দরখাস্তের বদলে ? আমি বুঝলাম যে, সাহেব তাই করেছেন। আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি বেশ তৎপরতার সঙ্গেই উত্তর দিলাম—'দরখাস্ত ত' আমি করিনি স্যার ! আমাকে নরেনবাবু পাঠিয়েছেন।'···এইখানে বলে দিই যে, আমার সেই আত্মীয়টির নাম নরেনবাবু।

আমাকে অবাক করে দিয়ে সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। প্রথমে তাঁর হাসির কারণ আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে বুঝলাম যে, আমার কথা শুনেই সাহেব হেসেছেন। সাহেবের কথা শুনেই বুঝলাম।

হাসি থামলে সাহেব বললেন,—'আমি তা জানি বাবু। আমি তা বলিনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম···', সাহেব আবার হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—'তুমি ত' বামুন। বামুন মাত্রেরই একটা করে 'আর্জ্জি' থাকে, যেমন মুখার্জ্জী, ব্যানার্জ্জী, চ্যাটার্জ্জী, কিন্তু তোমার নামের পেছনে যে 'আর্জ্জি'

নেই।…তোমার নাম গাঙ্গুলী না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'গাঙ্গার্জ্জী !'

সাহেবের সরস ব্যাখ্যা শুনে আমিও হেসে উঠলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, আমিও তাঁর সঙ্গে রসিকতা করার লোভ ছাড়তে পারলাম না। তাই হাসিমুখে বললাম, 'সাহেব, আপনি যা বললেন তা ঠিক ; কিন্তু আপনার হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে। সাধারণ বামুনদের নামের শেষে 'আর্জ্জি' থাকে বটে, কিন্তু আমি সমস্ত বামুনের সেরা কিনা, তাই নিজেই হচ্ছি আর. জি. (R. G.)।

সাহেব প্রথমে আমার রসিকতাটুকু বুঝতে পারেননি। কিন্তু একটু চুপ করে ভাববার পরই বুঝতে পারলেন।—প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সাহেব বললেন, "ঠিক বাবু, ঠিক বাবু, ঠিক ! অদ্ভুত তোমার বুদ্ধি ! চমৎকার ! আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি।"

ঠাকুর্দ্দা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"একি ঠাকুর্দ্দা, শেষ না করেই উঠেছেন ?"—সকলে এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল।

"শেষ ? হুঁঃ, তোরা একেবারে আকাট মুখ্যু ! এর আবার শেষ বলতে হয় নাকি ?"—ঠাকুর্দ্দা বললেন,—"সাহেব সেদিন আমার উপর কি রকম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতেই পারছিস ত' ! তা নইলে আমার সঙ্গে রসিকতা করেন !

আর তোরা বলছিস কিনা শেষ?…যে চাকুরিটা খালি ছিল, তার চেয়ে অনেক উঁচু কাজে সাহেব আমায় বসিয়ে দিলেন।”

“কেমন করে ঠাকুর্দ্দা? অন্যসব জায়গাই ত’ ভর্ত্তি ছিল!” —আমি বললাম।

আমার মুখের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে ঠাকুর্দ্দা বললেন,—“কেমন করে তা সাহেবকেই জিজ্ঞেস করে আয় না।”

ভুতুড়ে কাণ্ড

"মা, শুনেছ, রমুদা বিলেত থেকে ফিরে এসেছে", বলতে বলতে নরেন ছুটে এসে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল।

নরেনের মা রাত্রের জন্যে কুটনো কুটছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "কে বললে তোকে ?"

"এই ত' মাসীমা চিঠি দিয়েছেন!"—এই বলে নরেন একটা চিঠি মা'র সামনে ফেলে দিলে।

মা চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "হুঁ, তাহ'লে কাল এসে কলকাতা পোঁছুবে। তা তোর দাদাকে বল্ না একটা চিঠি লিখে দিতে, এখানে এসে দিনকতক থেকে যাবে'খন।"

"আচ্ছা", বলে নরেন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন পরই কোট্‌প্যাণ্ট পরা রমেন হাতে একটা স্যুটকেশ নিয়ে হরেনের সঙ্গে এল। হরেন তাকে ষ্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিল। হরেন চেঁচিয়ে বলল, "মা, রমুদা এসেছে।"

দাদার চীৎকার শুনে নরেন ছুটে আস্‌ছিল রমুদার ঘাড়ে-পিঠে চড়ে একটু উপদ্রব করবার জন্যে; কিন্তু সাম্‌নে সাহেবের মত 'স্যুট্'-পরা রমুদাকে দেখে একটু দমে গেল। খানিকটা ঘাব্‌ড়িয়ে সে একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে রইল তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

রমুদা যখন বিলেত গিয়েছিল, নরেনের বয়স তখন তিন-চার বছর। রমুদাকে তার খুব সামান্যই মনে ছিল; কিন্তু তাহ'লেও সে তার মা আর দাদাদের কাছে রমুদার নামটা এর আগে অনেক-বার শুনেছে। তাই সে ভেবেছিল যে, রমুদা তার দাদার মতই কাপড়-জামা পরা একজন সাধারণ মানুষই হবে। কিন্তু রমুদাকে কোট্‌প্যাণ্ট পরে আসতে দেখে সে প্রথমে একটু

ভড়্‌কে গিয়েছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে রমুদার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললে।

রমেনের শোবার জন্যে যে ঘরখানির বন্দোবস্ত করা হ'ল, সে ঘরটা প্রায় সব সময়ই বন্ধ থাকত। কেউ এলে বা বিশেষ কোন দরকার হ'লে ও-ঘরটা ব্যবহার করা হ'ত।

ঘরটা অনেকদিন বন্ধ পড়ে ছিল, তাই চারদিকে ময়লা জমে ছিল গাদা-গাদা! তার মেঝেয় ধুলো, আর দেওয়ালে কড়িকাঠে অসংখ্য ঝুল। ঘরটা পরিষ্কার করতে তাই সময় লাগল অনেকটা।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে রমেন ঘরে শুতে গেল। সেদিন সারা দুপুরটা ট্রেনে কেটেছে, তাই শোবার অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে শোবার পোষাক ছেড়ে বাড়ীতে পরবার প্যাণ্ট্‌টা খুঁজে দেখে যে, সেটা নেই। রাত্রে শোবার আগে সে প্যাণ্ট্‌টা বার করে আল্‌নায় রেখেছিল, কিন্তু সকালে উঠে দেখে যে, আল্‌না থেকে সেটা উধাও!

সে প্রথমে একবার ভাবলে যে, প্যাণ্ট্‌টা বোধহয় কেউ বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেছে কোন দরকারে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল যে, প্যাণ্টালুনে আবার কার কি দরকার হবে?

তার হঠাৎ মনে হ'ল যে, এ তাহ'লে নরেনবাবুর কাজ। হয় তার প্যাণ্ট্‌ পরবার সখ হয়েছে, না-হয় লুকিয়ে রেখে মজা করবার ইচ্ছে হয়েছে। কিংবা, হয়ত হরেনই মজা করবার

জন্যে নরেনকে প্যাণ্ট্‌টা লুকিয়ে রাখতে বলেছে,—আর সেইটেই বেশী সম্ভব।

রমেন ভাবলে যে, ওরা যেমন তাকে জব্দ করবার জন্যে প্যাণ্টালুনটা লুকিয়েছে, সেও তেমনি প্রথমে কিছু বলবে না। যেন কিছুই হয়নি এ রকম ভাব দেখাবে, তারপর কায়দা করে কথাটা বলবে। এই ভেবে সে আর একটা প্যাণ্ট্‌ বার করে পরলে।

একটু পরেই হরেন এসে ঘরে ঢুকল। বলল, "কি রমুদা, ঘুম ভাঙ্গল ?"

রমেন বললে, "হুঁ, ঘুম ত' অনেক আগেই ভেঙ্গেছে।"

"চল, তাহ'লে মুখ-হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নেওয়া যাক্‌।"

খেতে খেতে রমেন বললে, "মাসীমা, কাল রাত্তিরে আমার একটা প্যাণ্ট্‌ চুরি গেছে !"

হরেনের মা বললেন, "সে কিরে! চুরি গেল! কিন্তু এর আগে ত' এ বাড়ী থেকে কিছু চুরি যায় নি। ভাল করে সব খুঁজে দেখেছিস্‌ ত' ?"

রমেন হাসতে হাসতে বললে, "খুঁজে আর দেখব কি ? প্যাণ্ট্‌ রেখেছিলাম আলনায়, অন্য কোথায় কেউ না নিয়ে গেলে যাবে কি করে ? আর যদি অন্য কেউ নিয়ে যায়, তাহ'লে আমার পক্ষে খুঁজে বার করা শক্ত। অবশ্য, হরেন বলে দিতে পারে প্যাণ্ট্‌টা কোথায় আছে। বলে দাও ত' হরেন!"

"বাঃ রে, তোমার প্যাণ্ট্‌ কোথায় আছে, তা আমি কি করে

জানব ? শেষকালে কি তুমি আমাকেই চোর ঠাওরালে নাকি ?" হরেন বললে।

জিব্ কেটে রমেন বললে, "ছিঃ, ছিঃ, অমন কথা বোলো না, তোমাকে কি আমি চোর ঠাওরাতে পারি! তবে তুমি যে প্যাণ্ট্‌টার খবর জান, তা আমি ঠিক ঠাওরেছি।"

"বেশ আর কি! আমি তোমার ঘর থেকে প্যাণ্ট্ কি রকম করে নেব ? তুমি রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিলে!"

"তুমি না নিলে কি সেটা উড়ে গেল ? নিয়েছ নিশ্চয়ই, তা যে-কোন উপায়েই হোক।"

"সত্যি বলছি রমুদা, আমি তোমার প্যাণ্টের বিষয় কিচ্ছু জানি না।" হরেনের মুখে তখন রয়েছে বিস্ময়ের চিহ্ন, দুষ্টুমির নয়।

"সত্যি বলছ, তুমি নাও নি ?"

"সত্যি বলছি।"

"তাহ'লে প্যাণ্ট্ গেল কোথায় ? এ ত' মহা মুস্কিলের ব্যাপার দেখছি!" চিন্তিত মুখে হরেনের মা বললেন।

যাই হোক্, যখন কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়েই রমেনকে সে প্যাণ্টের কথা ভুলতে হ'ল।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রমেন দেখলে যে, আগের দিন সে যে প্যাণ্ট্‌টা পরেছিল, সেটাও আজ আর আলনায় নেই!

ও প্যাণ্টটাও যে আবার চুরি যেতে পারে, রমেন তা আশাও করেনি, তাই সেটাও সে আগের দিন রাত্রে আলনায়ই রেখেছিল।

রমেনের ভারি রাগ হ'ল। দুদিনে দু-দুটো প্যাণ্ট অদৃশ্য, কার না রাগ হয়? যাই হোক, সকালে ত' কিছু একটা পরতে হবে, শোবার পোষাক পরে থাকলে ত' আর চলবে না। কিন্তু তার কাছে আর অন্য প্যাণ্টও নেই, কেবল একটা দামী ভাল প্যাণ্ট ছাড়া। বাধ্য হয়ে সেটাই পরতে হ'ল।

সেদিন বিকেলবেলা রমেন হরেনের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। পথে যেতে যেতে হরেন বললে, "রমুদা, তোমার প্যাণ্ট্ চুরির কথা শুনে আজ আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। এখানকার অনেক লোকই এই গল্পটা জানে এবং আমি আমার এক বন্ধুর ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে এই গল্পটা শুনেছি।"

রমেন বললে, "বল, তোমার গল্পটা শোনা যাক।"

"তুমি যে ঘরটায় শোও, ও-ঘরটার একটু বদ্‌নাম আছে! অনেকে বলে, ও-ঘরে নাকি রাত্তিরে ভূত যাতায়াত করে। কিন্তু আমার ত' ও-কথা বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়, ভূত-যাতায়াতের কথাটার উৎপত্তি সেই গল্পটা থেকে। যাই হোক, গল্পটা শোনো।"

হরেন আরম্ভ করলে,—"আমার ঠাকুর্দ্দার অবস্থা প্রথমে অত্যন্ত খারাপ ছিল। তিনি যা উপায় করতেন, তার চেয়ে তাঁর

খরচ ঢের বেশী। তাই প্রত্যেক মাসেই তাঁকে কিছু-না-কিছু ধার করতে হ'ত, এবং তিনি ধার করতেন তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে। তাঁর সেই বন্ধুর বাড়ী ছিল পাশেরই এক গাঁয়ে। বন্ধু হ'লে কি হয়, ঠাকুর্দ্দার এই বাড়ীখানার উপর ছিল তাঁর বেজায় লোভ ; তাই তিনি ঠাকুর্দ্দাকে হ্যাণ্ডনোট নিয়ে টাকা ধার দিতেন। ঠাকুর্দ্দা প্রথমে তাঁর মতলব বুঝতে পারেন নি, কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন তখন তাঁর ভারি রাগ হ'ল। কিন্তু রাগ হ'লে কি হবে ? ধার তখন তাঁর এত বেশী হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর পক্ষে সে ধার শোধ করা সম্পূর্ণ অসাধ্য। তিনি ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেলেন।

একদিন হঠাৎ তিনি রাত্তিরে তাঁর বন্ধুকে নেমন্তন্ন করলেন ! দুজনে বেশ ভালভাবেই পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলেন। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনেই নিজের নিজের ঘরে শুতে গেলেন। তুমি যে ঘরটায় শোও ওই ঘরটায় ঠাকুর্দ্দার বন্ধুর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালবেলা দেখা গেল, বিছানার উপর ঠাকুর্দ্দার বন্ধুটি অসাড় হয়ে পড়ে আছেন, দেহে তাঁর প্রাণ নেই। ডাক্তার বললে যে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

খুব তাড়াতাড়ি মৃতদেহের সৎকার করা হ'ল, বাইরের লোকে বিশেষ কিছুই জানতে পারলেন না। তাইতেই তাদের সন্দেহ হ'ল যে, ঠাকুর্দ্দার বন্ধুকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে, এবং এই ব্যাপারে ঠাকুর্দ্দাও বিশেষভাবে জড়িত, অর্থাৎ তিনি তাঁর

বন্ধুকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন। যাই হোক, এইত' হল গল্পটা এবং এই থেকেই অনেকের ধারণা যে, ওই ঘরটায় রাত্তিরবেলা ভূত যাতায়াত করে।”

রমেন বললে, “তা হতেও পারে। ভূত যে আছে, এ আমি বিশ্বাস করি। সাহেবরাও আজকাল ভূত বিশ্বাস করে!”

সেদিন বাড়ী ফিরে হরেনের মনে হ'ল যে, ব্যাপারটা কি, তা আজ রাত্তিরে স্বচক্ষে দেখতে হবে। কাউকে কিছু না ব'লে সে রাত্তিরে রমেনের ঘর পাহারা দেবে।

তাই সে করলে। রাত্তিরে খাওয়ার পর সে নিজের ঘরে না গিয়ে, রমেনের ঘরে গেল। রমেনের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলে সে রমেনের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর রমেনও কাপড়-জামা ছেড়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

হরেন এদিকে বাইরে এসে একটা জায়গায় বসে রইল! সে এমন জায়গায় বসল যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়, কিন্তু যে কেউ রমেনের ঘরে ঢুকুক বা রমেনের ঘর থেকে বেরোক, সে তাকে ঠিক দেখতে পাবে।

হরেন বসে আছে ত' বসেই আছে, চোরের দেখা নেই! বারটা বাজল, একটা বাজল, দুটোও বেজে গেল! কাঁহাতক আর চুপ করে বসে থাকা যায়? হরেন ঢুল্‌তে লাগল! একবার করে ঘুমিয়ে পড়ে আবার সে একটু পরে চম্‌কে ওঠে! শেষকালে সে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল! হঠাৎ পায়ের

শব্দে চমকে উঠল। দেখলে যে, রমেনের ঘরের দরজা খোলা, আর একটা লোক তাদের বাগানের দিকে যাচ্ছে। লোকটার কাঁধে রমুদার দামী প্যাণ্টটা রয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি লোকটার পেছনে চলল। কাছে গিয়ে দেখলে, রমুদা নিজেই প্যাণ্ট কাঁধে নিয়ে বাগানের দিকে চলেছে। তার ভারি কৌতূহল হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত কি হয় দেখবার জন্যে সে রমুদার পেছনে চল্‌ল।

রমুদা বাগানের মধ্যে ঢুকল, সেও ঢুকল। রমুদা বাগানের একটা কোণের দিকে যেতে লাগল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। তারপর রমুদা একটা ঝোপের কাছে গিয়ে বসল, ঝোপের ভেতর থেকে বাগান কোপাবার কোদালটা বার করে নিয়ে একটা জায়গা খুঁড়তে লাগল। তারপর কোদালটা পাশে রেখে প্যাণ্টালুনটা তাল করে পাকিয়ে গর্ত্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিতে লাগল।

হরেন এইবার রমুদার পিঠে আস্তে একটা চড় মারলে, এবং রমেনও চমকে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, তারপর স্বপ্নোত্থিতের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে হরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হরেন বললে,—"রমুদা, এই বুঝি তোমার প্যাণ্ট চুরি যাওয়া!"

কিন্তু রমেন তার কথা বুঝতে পারলে না, বললে,—"কি হয়েছে সব খুলে বল্ দেখি! এই রাত্তিরে এ-বাগানে আমিই বা কি করে এলাম, আর তুইই বা কেন এলি?"

হরেন তখন সমস্ত কথা খুলে বললে, এবং শেষকালে বললে, —"ঘুমের ঘোরে উঠে এসে তুমি নিজেই এখানে প্যাণ্টটা পুঁতে রাখছিলে।"

লজ্জায় রমেন মাথা নীচু করলে।

তারপর সেই জায়গাটা খুঁড়তেই রমেনের সব ক'টা প্যাণ্টই বেরিয়ে পড়ল।

পরের দিনই রমেন কলকাতা পালিয়ে গেল।

রমেনের বিশেষ লজ্জার কোন কারণ ছিল না। কারণ, এ একটা রোগ-বিশেষ। ঘুমের মধ্যে অনেকে ঘুরে বেড়ায়, দৌড়াদৌড়ি করে, এমন কি, অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব করে বসে—নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। রমেনেরও এই রোগই হয়েছিল, অথচ সে নিজেই সেকথা জানতে পারে নাই! নিজের প্যাণ্ট নিজে সরিয়ে ফেলার কাজে তার নিজের কোনও হাত বা জ্ঞান ছিল না।

চমকে পেছন ফিরে দেখি যে লোকটার হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি।

ইংল্যাণ্ডের ছোট এক পাড়াগাঁয়ের পথে কতকগুলি ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দুপুরবেলা—কিন্তু শীতের দুপুর। তখনও সামান্য বরফ পড়ছিল।

রাস্তাঘাট বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। বাড়ীর দেওয়াল ও

দরজা-জানালার শার্সিতে বরফ লেগে রয়েছে। রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম। যারা গরীব ও হতভাগ্য, কেবল তারাই রাস্তায় বেরিয়েছে। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তাতে হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত কাঁপুনি লাগছে!

গাছপালার পাতা ঝরে গেছে। ছোট ছোট গাছ বা লতা বরফের ভারে এবং ঠাণ্ডায় নেতিয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। প্রকৃতি নিরানন্দ নিঝুম। প্রকৃতির নিরানন্দতার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ জীবজন্তু তাদের মনের আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে। পাখীরা গান ভুলে চুপ করে বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

এমন দিনেও কিন্তু ছেলেরা তাদের মনের আনন্দ হারায় নি। কতকগুলি ছেলে রাস্তায় বেরিয়েছে। প্রকৃতির নিরানন্দ ভাব তাদের যেন কিছুই করতে পারে নি! তারা বেশ স্ফুর্ত্তির সঙ্গেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

যে ক'টি ছেলে রাস্তা দিয়ে চলেছিল, পাড়ার লোকেরা তাদের নাম দিয়েছিল 'জন্ জন্‌সন্ এ্যাণ্ড কোং'। পরের অপকার করতে এরা খুব ওস্তাদ। এদের দলের সর্দ্দার হচ্ছে জন, পাড়ারই ছেলে। যত রকমের দুষ্টু বুদ্ধি এবং অপকার করবার ফন্দী তারই মাথায় আগে আসে; তাই দলের ছেলেরা তাকেই সর্দ্দার করেছিল। যাই হোক, জন তার দলবল নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। কি যে তাদের মতলব, তা তারাই জানে!

যেতে যেতে তারা দেখলে যে, রাস্তার ধারে একটা বাড়ী। অমনি জনের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়ে উঠল! সে রাস্তা থেকে একটা বরফের ডেলা কুড়িয়ে নিলে। তারপর দলের অন্য ছেলেদের বললে,—আচ্ছা, বল ত' এই বরফের ডেলাটা ছুঁড়ে মারলে ওই শার্সিটা ভাঙ্গবে কিনা?—বলে সেই বাড়ীটার একটি জানালার শার্সি দেখিয়ে দিল।

কেউ কেউ বললে,—ভাঙ্গবে।

আবার কেউ কেউ বললে,—ভাঙ্গবে না।

—আমি বলছি যে, ভাঙ্গবে।—বলেই সে বরফের ডেলাটা ছুঁড়ে মারলে শার্সিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করে শার্সি গেল ভেঙ্গে।

যারা বলেছিল যে শার্সি ভাঙ্গবে, তারা আনন্দে লাফাতে লাগল। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ আনন্দ করা হ'ল না। শার্সি-ভাঙ্গার শব্দ বাড়ীর লোকেরা শুনতে পেয়েছিল, অল্পক্ষণ পরেই বাড়ীর ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে তাদের দেখে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছুটতে আরম্ভ করলে।

সেই লোকটাই বাড়ীর কর্ত্তা, এবং সে জনকে চিনত। সে তৎক্ষণাৎ চলে গেল জনের বাবার কাছে।

জনের বাবা তখন বাইরের ঘরে বসেছিলেন। সে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে।

জনের বাবা তাকে বেশ আনন্দের সঙ্গেই অভ্যর্থনা করলেন। বললেন,—কি ব্যাপার ?

—আপনার কাছে একটু পরামর্শ নিতে এসেছি। লোকটা বললে।

—বলুন, বলুন, কি বিষয়ে পরামর্শ চান ? জনের বাবা বললেন।

—দেখুন, যদি কোন দুষ্টু ছেলে আমার বাড়ীর জানালার শার্সি ভেঙ্গে দেয়, তাহলে আমার কি করা উচিত ?

—আপনি সেই দুষ্টু ছেলের বাপের কাছ থেকে ক্ষতি-পূরণ দাবী করুন। আর যদি ক্ষতি-পূরণ না পান, তাহলে নালিশ করবেন।

—তা কত পাউণ্ড আমি ক্ষতি-পূরণ হিসাবে দাবী করতে পারি ?

—ব্যাপারটা খুবই সামান্য। তবুও আপনি দশ পাউণ্ড দাবী করতে পারেন।

—বেশ, তাহলে আপনি আমাকে দশ পাউণ্ড ক্ষতি-পূরণ দিন। আপনার ছেলেই আমার বাড়ীর জানালার শার্সি ভেঙ্গে দিয়েছে।—লোকটার মুখ চোখের ভাব ও কথা বলার ভঙ্গী এক মুহূর্ত্তে পালটে গেল।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে জনের বাবার খানিকটা সময় লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন—ও! আমার ছেলে

আপনার জানালার শার্সি ভেঙ্গে দিয়েছে, তবে ত ক্ষতি-পূরণ আমার করাই উচিত।—এই বলে তিনি দশ-পাউণ্ড তার সামনে রেখে দিলেন।

লোকটিও পাউণ্ডগুলি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে গম্ভীরভাবে দরজার দিকে পা বাড়ালে।

কিন্তু দরজার বাইরে যাবার আগেই জনের বাবা বললেন,—ও কি মশাই, চলে যাচ্ছেন যে? আমার ফীটা—পনেরো পাউণ্ড!

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে লোকটারও নেহাৎ কম সময় লাগল না। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পনেরোটা পাউণ্ড তাঁর সামনে রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার একটু ভুল হয়েছিল। জনের বাবা উকিল!

ঝড়ের রাতে

বর্ষাকাল। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দে আমাদের বিরক্তি ধরছিল। কিন্তু উপায় নেই! বৃষ্টির শব্দ বন্ধ করা ত' আমাদের সাধ্য নয়! তাই জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাধ্য হয়েই আমাদের ক্লাব-ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হ'ল।

বসে বসে আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা কইছিলাম, এবং বৃষ্টি না থামায় আমরা বাইরে বেরোতে পারছিলাম না; তাই আমাদের কথাবার্ত্তা ক্রমশঃ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছড়িয়ে

পড়তে লাগল। অবশেষে আমাদের কথাবার্ত্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, "ভূত আছে কি না।"

নগেনদা আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু তাহলে কি হয়, তিনি আমাদের সকলের সঙ্গেই সমবয়সীর মত হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করতেন। কিন্তু আজকে কেন জানি না, তিনি চুপচাপ বসেছিলেন! বোধহয় এই একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে তাঁর কোন পুরোণো কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

ভূতের কথা উঠ্‌তেই নগেনদা একটু কেশে গলাটা সাফ করে বল্লেন—"নেহাৎ ভূতের প্রসঙ্গ যখন তুললে, তখন শোনো, আমার জীবনেরই একটা ঘটনা। ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই কথাই আজ সংক্ষেপে তোমাদের কাছে বলছি।"

ভূতের গল্প, তাও আবার সত্য ঘটনা! এই বৃষ্টি-বাদ্‌লার দিনে অত্যন্ত মুখরোচক জিনিস। গল্পের নাম শুনেই আমরা সব নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বস্‌লাম।

নগেনদা আরম্ভ করলেন—

"অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন সবে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি। গরমের ছুটিতে আমি সেবার মামার বাড়ী গিয়েছিলাম। তোমরা সকলেই বোধহয় আমার মামার বাড়ী কোথায়,

তা জান; আর যদি না জান, তাহলে আর তা জেনে দরকার নেই। জায়গাটার নাম না জানলেও ব্যাপারটা বুঝতে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

রোজ বিকেলবেলা আমি বেড়াতে বেরোতাম, এবং এক-একদিন অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যেতাম। একদিন ওই-রকম ভাবে বেড়াতে বেড়াতে আমি একেবারে গ্রামের শেষে চলে গিয়েছিলাম। সেদিকে লোকের বাস ছিল না এবং রাস্তার ধারে গাছপালা বড় হয়ে বেশ ঘন বনের সৃষ্টি করেছিল। বিকালবেলা যাবার সময় অতটা খেয়াল করি নি, সেই বনের মধ্যে দিয়েই বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

ক্রমশঃ সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যে দেখে আমার হুঁস হ'ল— তাইত, অনেকদূরে চলে এসেছি, এবার ফিরতে হবে। যাই হোক, আমি বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগলাম। হঠাৎ মেঘের ডাকে চমকে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি যে, কখন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে! গাছের ডালপালা একটুও নড়ছে না। তক্ষুণি ঝড় উঠবে বলে মনে হ'ল।

তাইত, বেড়াতে বেড়াতে অনেকদূর চলে এসেছি! এখন যদি পথের মধ্যে ঝড় ওঠে বা বৃষ্টি আসে, তাহলে কি করে বাড়ী ফিরব?—ভেবে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কি করব, উপায় ত' নেই! তাই তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলাম।

ক্রমশঃ অন্ধকার এত গাঢ় হয়ে এল যে, দূরের জিনিষ আর দেখা গেল না। আমার মনে তখন ভয় হ'ল—রাস্তা যদি ভুল হয়ে যায়! দিনের আলোয় অত খেয়াল না করে এগিয়ে এসেছি, এখন অন্ধকারে রাস্তা চিনে বাড়ী ফিরতে পারলে হয়।

এমন সময় ঝড় উঠল। দমকা হাওয়ায় গায়ের ঝরা পাতা আর রাস্তার ধুলো উড়ে এসে চোখে মুখে লাগতে লাগল। তখন এমন হ'ল যে, চোখ খুলে পথ চলা অসম্ভব। অথচ, মুস্কিল হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে আবার রাস্তা হাঁটা যায় না। তাতে নর্দ্দমায় পড়তে পারি অথবা গাছে মাথা ঠুকে যেতে পারে। যাই হোক, চোখে হাত রেখে মাটির দিকে চেয়ে আমি কোন রকমে আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম।

এইবার সুরু হ'ল বৃষ্টি। বৃষ্টি নামতেই ঝড়ের বেগটা অনেক কমে গেল বটে, কিন্তু বেড়ে চল্‌ল বৃষ্টির বেগ। সে কী মুষলধারে বৃষ্টি!—বড় বড় ফোঁটাগুলি ছুঁচের মত যেন শরীরে বিঁধতে লাগল! শীগ্‌গির যে সে থাম্‌বে, তার কোনো সম্ভাবনাও দেখা গেল না।

আশে পাশে চারিধারে গাঢ় অন্ধকার,—এক হাত দূরের জিনিষ ভালো করে নজরে পড়ে না। আমি মরিয়া হয়ে ছুটতে সুরু করলাম। কিন্তু বাড়ীর দিকে ছুটছি কি উল্টো

দিকে ছুটছি—তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথায় যেন গোল বেধে গেল !

কতক্ষণ যে ও-রকম ভাবে ছুটেছিলাম, তা আমার ঠিক মনে নেই। হঠাৎ কিছুদূরে একটা আলো দেখে আমার মনে ভরসা হ'ল—তাহলে বোধ হয় লোকালয়ে পৌঁছেছি ! এই ভেবে আমি আলোটা লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম—উপস্থিত ত' একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে ! তারপর বৃষ্টি থামলে বাড়ী যাওয়ার কথা ভাব্‌ব।

আলোটা লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর, আমি একটা বড় বাড়ীর সামনে গিয়ে পড়লাম। দেখলাম, পাশেই একটা দরজা। দরজাটা ভেঙে গেছে।

বাড়ীর ভিতর থেকে তখন আর সেই আলোটা দেখা যাচ্ছিল না। তবু আমি বাড়ীটার ভিতর ঢুকলাম এই ভেবে যে, আলো যখন দেখেছি তখন বাড়ীতে নিশ্চয়ই লোক আছে। বাড়ীটা খুব পুরোণো আর একেবারে নিস্তব্ধ। কারো সাড়াশব্দ নেই। আমি ভাবলাম, বোধহয় রাত্রি হয়ে গেছে আর বৃষ্টি পড়ছে, তাই বাড়ীর লোকেরা হয়ত এর মধ্যেই শুয়ে পড়েছে। যাই হোক, আমি হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়ীর ভিতরদিকে যেতে লাগলাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তবুও আমার মনে হ'ল যে, বাড়ীটা অত্যন্ত নোংরা। মাথার উপরে চামচিকে

ওড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম, আর আমার হাতে অনবরত ঝুল লাগছিল।

হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে কিছুদূর যাবার পর আমি আবার আলোটা দেখতে পেলাম। একটা ঘরের দরজার সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে আলোটা দেখা যাচ্ছিল।

আমি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর দরজার ওপর টোকা মারলাম। টোকা মারার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে একটা হুড়মুড় করে শব্দ হল। শব্দটা শুনে আমি চম্‌কে উঠলাম; আর আমার হাতের ধাক্কা লেগে দরজাটা খুলে গেল। আমি দেখলাম যে, ঘরের মধ্যে একটা লোক চেযার-সুদ্ধ উল্টে পড়ে রয়েছে। লোকটা খুব সম্ভব চেয়ারে বসেছিল, টোকা মারার শব্দে ভয় পেয়ে উঠে পালাতে যাচ্ছিল, আর তাড়াতাড়িতে চেয়ারসুদ্ধ উল্টে পড়ে গেছে!

আমাকে দেখে লোকটা উঠে বসল। তারপর আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে বললে—'কে তুমি? কি চাই তোমার?'

লোকটা আমার দিকে যে-রকম করে তাকাচ্ছিল, তাতে আমার অত্যন্ত ভয় করছিল; মনে হচ্ছিল, এ জায়গা ছেড়ে এক্ষুণি চলে যাই। কিন্তু এই বৃষ্টিতে যাবই বা কোথায়?

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম—'দেখুন, বড় বিপদে পড়েছি, আপনি যদি কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় দেন।'

লোকটা হঠাৎ চটে উঠল। বল্‌লে—'বিপদ্! বিপদ ত আমি করব কি! আমি নিজে যে বিপদে পড়েছি তারই ঠেলা সামলাতে পারছি না! আমি আবার ওকে আশ্রয় দেব! হুঁ!'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভেবে বললে—'আচ্ছা, কি বিপদ্ শুনি,—পুলিশে তাড়া করেছে বুঝি?'

'আজ্ঞে না, এমন কোন কাজ আমি করিনি যার জন্যে পুলিশে তাড়া করবে। তাছাড়া এই নির্জ্জন বনে এই বৃষ্টিতে পুলিশ আসবেই বা কিরূপে?'—আমি বললাম।

মনে হ'ল আমার কথা শুনে লোকটা একটু সন্তুষ্ট হয়েছে। আগেকার চেয়ে গলার স্বর একটু নরম করে সে বললে—'তবে আবার বিপদ্ কি?'

আমি বললাম—'আমার বাড়ী এখানে নয়। এখানে আমি মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি। রোজ বিকেলেই আমি বেড়াতে বেরোই। আজও বেরিয়েছিলাম। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে আজ অনেকদূর এসে পড়ি। যখন বাড়ী ফিরছিলাম তখন হঠাৎ ঝড় এল, তার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি। আমি ছুটে বাড়ীর দিকে যেতে যেতে বোধহয় রাস্তা ভুলে এখানে এসে পড়েছি। বৃষ্টি না থামলে যে রাস্তা ঠিক করে বাড়ী পৌঁছুতে পারব, তা ত' মনে হয় না। তাই বৃষ্টি না-থামা পর্য্যন্ত আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।'

লোকটা যেন খুব খুসী হয়েছে এই রকম ভাব দেখিয়ে বললে—'তুমি ত' আচ্ছা লোক হে! রাস্তা আবার কেউ ভুল করে নাকি! তাছাড়া, এখন এমন কি জোরে বৃষ্টি পড়ছে! বৃষ্টি পড়েছিল সেই সে বছর! এটা কোন্ বছর?'

'১৯২৬ সাল।'—আমি বললাম।

'১৯২৬ সাল! এত বছর কেটে গেছে! সেটা বোধহয় ১৮১২ সাল। সে বৃষ্টি দেখলে তোমরা অবাক্ হয়ে যেতে! গ্রামকে গ্রাম সব ভেসে যাবার যোগাড়!'

'১৮১২ সাল, না ১৯১২ সাল?'—আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

লোকটা একটা উৎকট হাসি হেসে বললে—'আরে না, না, ১৯১২ সাল নয়, ১-৮-১-২ সাল।' লোকটা অসম্ভব রকম জোর দিয়ে '১৮১২ সাল' শব্দটা উচ্চারণ করলে।

লোকটার কথা বলার ভঙ্গি অতি অদ্ভুত! তবে হাসিটাও আমার কাছে বিশেষ প্রীতিকর বলে মনে হ'ল না। তারপর যে সালের কথা সে বল্লে, সেও তো ১১৪ বছর আগেকার কথা! তবে কি—ভূতের পাল্লায় এসে পড়লাম নাকি? এখন প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচি! যদিও আমার সাহস ছিল অত্যন্ত বেশী, কিন্তু এই ব্যাপারে যেন একটু মুষড়ে পড়লাম!

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে লোকটা আবার বললে—'তুমি কি বলছিলে? এখানে বেড়াতে এসেছ, বললে না?'

আমি বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

'কাদের বাড়ী এসেছ?'—লোকটা বললে।

'হরিশবাবুদের বাড়ী'—আমি বললাম।

'হরিশ! কোন্ হরিশ? হরিশ চাটুজ্যে?'—লোকটা বললে।

'আজ্ঞে না, হরিশ গুপ্ত'—আমি উত্তর দিলাম।

'হরিশ গুপ্ত!'—লোকটা যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল—'আমি এখানকার সকলকেই ত' চিনি। হরিশ গুপ্ত বলে ত' কেউ এখানে থাকে না। নাঃ, তোমার দেখছি মাথার গোলমাল আছে।'—বলে লোকটা হো হো করে হেসে উঠল। আবার সেই রকম প্রাণ-কাঁপানো উৎকট হাসি!

আমার ভারি রাগ হ'ল। লোকটা কিনা বললে যে, আমার মাথার গোলমাল আছে! কিন্তু কি আর করব? যার পাল্লায় পড়েছি, তার ওপর রাগ করার কোন মানে হয় না। তাই কিছু না বলে চুপ করেই গেলাম।

লোকটা এবার উঠল। উঠে বললে—'তুমি একটু ব'স আমি এখুনি আসছি। হ্যাঁ খবরদার, ওদিকের ঘরটায় যেও না বলছি, তাহলে ভাল হবে না'—বলে পাশের একটা দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিয়ে লোকটা আমার মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে চলে গেল।

কি অদ্ভুত সেই চাউনি! আমার দেহের মধ্যে রক্ত যেন দ্রুতবেগে চলাচল করতে লাগল! আমি যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম! আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল, কিন্তু আমি উঠে চলে যেতেও পারলাম না।”

এ পর্য্যন্ত বলে নগেনদা চুপ করলেন। আমিও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলাম, তারপরে প্রায় সকলেই বললাম—“বাঃ, এ-রকম জায়গায় এসে চুপ করলেন কেন? বলে যান। বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো!”

নগেনদা বললেন,—“হাঁ বল্‌ছি।” বলে আবার আরম্ভ করলেন—

“লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে কোন্‌দিকে গেল, আমি তা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু দরজা থেকে বেরিয়েই কোন্ দিকে যে সে চলে গেল, আমি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কয়েক সেকেণ্ড বসে থাকার পরই আমার মনে হ’ল—তাইত লোকটা আমায় পাশের ঘরে যেতে বারণ করে গেল কেন? প্রথমে মনে হ’ল, হয়ত শুধু শুধুই সে আমায় বারণ করেছে!

কিন্তু শুধু শুধুই বা বারণ করবার কি মানে হয়? যাকগে, ওকথা ভেবে আর কি হবে? তাই আমি ওকথা ভুলবার চেষ্টা করলাম এবং সেইজন্যেই ঘরের চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কোথায় কি আছে।

ঘরটা বাড়ীর ভিতরের ঘর বলে মনে হ'ল। আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করলাম যে, ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র যা আছে, তা সবই পুরোণো। মনে হ'ল যে, লোকটা নতুনের চেয়ে পুরোণোর বেশী ভক্ত।

আমি আগেই বলেছি যে, ঘরটা দেখে আমার বাড়ীর ভিতরের ঘর বলেই মনে হল, আর তা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে ফের সেই কথা জাগ্‌ল—তাইত লোকটা কেন আমাকে ওই ঘরটায় যেতে বারণ করলে? কই, সে ত অন্য কোন ঘরের কথা কিছুই বললে না, কেবল ওই ঘরটায় ঢুকতেই সে আমায় বারণ করে গেল। এর কারণ কি?

যতই আমি এ-কথাটা ভাবতে লাগলাম, ততই ও-ঘরে কি আছে দেখবার জন্য আমার মন ব্যস্ত হয়ে উঠল, আর আমার অজ্ঞাতসারেই যে কখন আমি চলতে আরম্ভ করে দিয়েছি, তা জানতে পারলাম যখন সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

দরজাটা খোলাই ছিল। আস্তে টোকা মারতেই দরজা একদম খুলে গেল।

ঘরের একপাশে একটা টেবিল, আর সেই টেবিলের উপর একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছিল। অন্য পাশে একটা খাট। টেবিল-ল্যাম্পের সেই স্বল্প আলোকে খাটের দিকে চাইতেই আমি চম্‌কে উঠলাম। কিছুক্ষণের জন্য কি করতে হবে ভুলে গিয়ে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জমিদার উঁকি মেরে দেখলেন—হাতের ওপর মাথা রেখে বন্দী নিশ্চল ভাবে বসে আছে।

আমি যে চম্‌কে উঠ্‌লাম, তা বাজে কারণে নয়। শুধু আমি কেন, যে কোন লোকই সে দৃশ্য হঠাৎ দেখলে চমকে উঠ্‌ত। আমি দেখলাম যে, খাটের উপর একটা লোকের অসাড় মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

দূর থেকেই বেশ বুঝতে পারলাম যে, লোকটা মারা গেছে। তার মুখচোখ আর অন্য যেসব অংশ দেখা যাচ্ছিল, তা একেবারে ফ্যাকাশে!

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আমার অবস্থা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম যে, এ-রকম অবস্থায় যদি আমাকে সেই লোকটা এখানে দেখে, তাহলে আমার সমূহ বিপদ্। কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এখান থেকে পালানোই ভাল। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, লোকটা ফিরে আসেনি। ভাবলাম, এখান থেকে পালানোই ঠিক, নইলে লোকটা যদি আবার কিছু করে! ভূতের পক্ষে কোন কিছু করাই অসম্ভব নয়।···

আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। দরজা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ এল—'তুমি ভেবেছ যে, আমাকে লুকিয়ে সব দেখে নিয়ে পালাবে? সেটি হচ্ছে না চাঁদ! হাঃ, হাঃ, হাঃ।' লোকটা বিকট অট্টহাসি করে উঠল।

তাইত, লোকটা কেমন করে ঘরে ঢুকল? ঘরে ঢোকবার কি অন্য কোন দরজা আছে? চমকে পেছন ফিরে দেখি যে,

লোকটার হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

কি ভয়ঙ্কর! না, আর অপেক্ষা করা চলে না। আমি ছুটলাম। তক্ষুণি শুনতে পেলাম যে, লোকটা হেসে উঠল—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

এ-হাসি যেন এ-জগতের নয়! কিন্তু আমি কোন দিকে লক্ষ্য না-করে, বাইরে যাবার দরজা যেদিকে, অনুমান করে সেইদিকে ছুটলাম।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দু-একবার দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল। কিন্তু আমার তখন সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমার মনে হ'ল, লোকটা যেন আমার পেছনে পেছনে আসছে আর কেবলই হাসছে 'হাঃ, হাঃ, হাঃ!' কিন্তু সে যেন হাসি নয়, অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে যারা মরে, তাদের করুণ ক্রন্দন!......

আমি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ছুটতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল যে, তাইত, আমি যদি ভুল দিকে এসে থাকি? আমার একবার সন্দেহও হ'ল যে, আমি ভুল দিকে এসেছি, তা নইলে ত' এতক্ষণ দরজায় পৌঁছে যাবার কথা। তখনই আবার মনে পড়ল যে, এটা ভূতুড়ে-বাড়ী, এখান থেকে নিস্তার পাওয়া হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু ভেবে আর লাভ কি? বাঁচবার চেষ্টা করতেই হবে, তাই আমি আবার ছুটতে লাগলাম।

ছুটতে ছুটতে আমি একটা পাঁচিলের কাছে এসে পড়লাম। আমার অদৃষ্ট ভাল,—দেখি পাঁচিলটা ভাঙ্গা। চোখের নিমেষে আমি পাঁচিলটা ডিঙ্গিয়ে গেলাম। সামনেই দেখি রাস্তা। রাস্তা ধরে আমি সামনের দিকে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু লোকটা তখনও আমার পেছনে আসছে।

ছুটে ছুটে আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লাম, আর ছুটতে পারি না। তখন আর-একবার ছুটবার চেষ্টা করতেই আমি পড়ে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন কিছু দিয়ে আমার মাথায় মারলে এক ঘা! এবং আমিও জ্ঞান হারালাম।”......

নগেনদা চুপ করলেন।

আমরা বললাম—“তারপর?”

“তারপর?”—নগেনদা বললেন, “মরিনি ত দেখতেই পাচ্ছ। তারপর আর কি থাকতে পারে?”

“তবু শেষ পর্য্যন্ত আপনার মুখ থেকে না-শুনলে মনটা একটু খুঁত খুঁত করবে”—রমেন বললে।

নগেনদা একটু হেসে বললেন—“তবে শোন ঃ

তারপর যখন জ্ঞান হ’ল, চেয়ে দেখি যে বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে আছি। বিছানার চারদিকে দিদিমা, মামা ও মামীরা সব উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। মেজমামার মুখ থেকে বাকি ঘটনাটা সব শুনলাম।—

রাত্রি পর্য্যন্ত আমি বাড়ী না ফেরায় সকলে ব্যস্ত হয়ে

পড়েছিলেন, এবং আমার খোঁজ করবার জন্য মামারা সব আলো নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

বাড়ী থেকে কিছু দূরে যে ভাঙ্গা জমিদার-বাড়ীটা আছে, তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন যে, কে একজন পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় পড়ে ছুটতে লাগল! দেখে তাঁদের সন্দেহ হ'ল। তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন, এবং কাছাকাছি এসে বুঝতে পারলেন যে, আমিই ও-রকম ভাবে ছুটছিলাম। কিন্তু আমার ও-রকম ভাবে ছোটার কারণ তাঁরা খুঁজে পাননি। যাই হোক, আমার পিছনে কিছুদূর আসবার পর তাঁরা দেখলেন যে, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ আমি রাস্তার উপর পড়ে গেলাম।

তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে, আমি বোধহয় পা পিছলে পড়ে গেছি। কিন্তু কাছে এসে তাঁরা দেখলেন যে, আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি এবং আমার কপাল কেটে গেছে। তাঁরা তখন ধরাধরি করে আমাকে বাড়ী নিয়ে যান।

আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠ্‌লে মেজমামা আমাকে প্রশ্ন করলেন, কেন আমি পোড়ো বাড়ীটার ভিতর গিয়েছিলাম আর কেনই বা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে উল্টো দিকে ছুটছিলাম?

আমি তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললাম। বললাম, 'ঝড়-বৃষ্টিতে আশ্রয় নিতে গিয়ে একেবারে সটান ভূতের পাল্লায় পড়ে গেছিলাম!'

মেজমামা দেখে বললেন, ‘ভূতের পাল্লায় নয়, পড়েছিলি ভূতোর পাল্লায়। লোকটার নাম ভূতো, ভূত নয়, আস্ত পাগল।’

আমি প্রশ্ন করলাম, ‘তবে ঘরের মধ্যে ওই মরা লোকটি কে?’

মেজমামা হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, ‘মরা লোক না হাতী! ওটা ওরই কারসাজি। তোকে ভয় দেখাবার জন্যে নিজেই ও ওইভাবে মরা সেজে শুয়ে ছিল। আরো অনেক লোককেও এ-ভাবে ভয় দেখিয়েছে। লোকটার অদ্ভুত স্বভাব!’—”

নগেনদা তাঁর গল্প শেষ করলেন।

বন্ধু

বৃদ্ধ জমিদার মশাই-বাইরের ঘরের মধ্যে অতি চঞ্চলভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন।

রাত্রি গভীর। সমস্ত বাড়ী, সমস্ত গ্রামটাও যেন ঘুমিয়ে নিশুতি হয়ে গেছে! কিন্তু সারা গাঁয়ের মালিকের চোখেই

আজ রাতে ঘুম নেই। বহুদিনের পুরাণো একটা কথা আজ তাঁর মনে জেগে উঠে তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে।

পনের বছর আগে। তখন সবে মাত্র তাঁর বাবা মারা গেছেন এবং বৃহৎ জমিদারীটা তাঁর হাতে এসে পড়েছে। সেই সময় একদিন কলকাতা থেকে তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁর কাছে বেড়াতে এলেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা যখন তাঁদের আড্ডা জমেছিল, তখন নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে হঠাৎ কথা উঠল যে, ফাঁসি ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের মধ্যে কোন্‌টা ভাল ?

বন্ধুদের মধ্যে অধিকাংশই মত প্রকাশ করলেন যে, ফাঁসির চেয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরই ভাল। কেউ কেউ আবার এমন মন্তব্যও করলেন যে,—ফাঁসির ব্যবস্থা একদম তুলে দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করাই গভর্ণমেণ্টের উচিত।

জমিদার মশাই সেদিন বলেছিলেন,—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের চেয়ে, ফাঁসিই ভাল ; কারণ, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে মানুষকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারে, কিন্তু ফাঁসি দিলে পরে সুদীর্ঘ দিন ধরে এই যে কষ্টটা—এটা আর মানুষ পায় না। যে মরবেই, তাকে একটু একটু করে কষ্ট দিয়ে না-মেরে একেবারে মেরে ফেলাই কি ভাল নয় ?

বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন উকিল ছিলেন। তিনি কোন কথা না-বলে চুপ করে বসে সব কথা শুনছিলেন। একজন তাঁকে

তাঁর মত কি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—ফাঁসি আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের মধ্যে কোনটাই ভাল নয়; কিন্তু এই দুটোরই মধ্যে থেকে যদি কোন্‌টা ভাল তা বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরটাই পছন্দ করব। কারণ, আমার মতে একেবারে মরে যাওয়ার চেয়ে, যেমন করে হোক, বেঁচে থাকাটাই ভাল।

জমিদার মশাই এ-কথা শুনে রুখে উঠলেন, এবং টেবিল চাপড়ে বলতে লাগলেন,—আমি এ-কথা মানি না! এর জন্যে আমি কুড়ি হাজার টাকা বাজী ফেলতে রাজী আছি। যাবজ্জীবন ত' দূরের কথা—তুমি যদি পাঁচ বছর বদ্ধ ঘরের ভেতর বন্দীর মত থাকতে পার, তাহলে আমি তোমাকে কুড়ি হাজার টাকা দেব।

উকিল বন্ধু উত্তেজিতভাবে বললেন—তাহলে পাঁচ বছর কেন, পনের বছর আমি বন্দী হয়ে বদ্ধ ঘরের মধ্যে থাকতে রাজি আছি।

ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হ'ল না।

সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি লেখাপড়া হ'ল—উকিল মশাইকে পনের বছরের জন্য সম্পূর্ণ একলা বদ্ধ ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে হবে। এই পনের বছরের জন্য তাঁর খাওয়া-পরার ভার জমিদার মশাই নেবেন। তা ছাড়া তাঁকে একটি পিয়ানো ও পড়বার জন্যে তাঁর ইচ্ছামত বই দেওয়া হবে। কিন্তু ঠিক পনের বছর পূর্ণ হবার

এক মিনিট আগেও যদি তিনি ঘর থেকে বেরোন বা জীবন্ত লোকের মুখ দেখেন, তাহলে জমিদার মশাই তাঁর প্রতিশ্রুতি মত কুড়ি হাজার টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন না। আর সর্ত্ত মেনে যদি তিনি পনের বছর কাটিয়ে দিতে পারেন, তাহলে তাঁকে পনের বছর পরে মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদার মশাই কুড়ি হাজার টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

* * * *

পনের বছর পূর্ণ হয়েছে। বন্ধু আজ মুক্ত হলেই তাকে বিশহাজার টাকা দিতে হবে। জমিদার আজ তাই এত চিন্তিত, এত উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিলেন। ওঃ, পনের বছর ধরে তাঁর বন্ধু কি ভাবে জীবন যাপন করছে! সে যেসব চিঠি লিখত, তা থেকেই তা জানা যায়।

প্রথম বছর তার ভয়ানক একলা একলা মনে হয়েছিল। সুতরাং নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে প্রথম বছর সে অনবরত পিয়ানো বাজিয়েছে এবং গল্প ও উপন্যাস পড়েছে।

দ্বিতীয় বছর তার পিয়ানোয় অরুচি ধরে গেল। গল্প-উপন্যাসও আর ভাল লাগল না। তাই দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি ভাল ভাল বই পড়তে আরম্ভ করলে।

আরও দুটো বছর এমন করেই কেটে গেল।

পঞ্চম বছরে আবার সে পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করলে। এ-বছর আর কোন বইই সে চেয়ে পাঠালে না। এই বছরটা

এবং পরের বছরের কয়েক মাস শুধু খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে হাই তুলে কাটিয়ে দিলে। মাঝে মাঝে আপন মনে কি সে সব বকত এবং কাগজে সব লিখত। কিন্তু লেখবার পরেই সব সে ছিঁড়ে ফেলত। তাকে কাঁদতেও শোনা যেত মাঝে মাঝে।

ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সে বিভিন্ন ভাষা শিখতে আরম্ভ করলে। এই সময়ে সে যে-সব বই চেয়ে পাঠাত, তা সংগ্রহ করা জমিদার মশায়ের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ত।

চার বছর এইভাবে ভাষা শিক্ষা চলল। এই চার বছরে জমিদার মশাইকে তার জন্যে বিস্তর দামী দামী বই কিনতে হয়। অবশেষে চার বছর পরে জমিদার মশায় একটা চিঠি পেলেন,—"বন্ধু, খানিকটা লেখা আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। এই রচনাটি ছ'টি বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। দয়া করে ভাষাবিদ্‌দের এই লেখাটি দেখিয়ো; এবং তাঁরা যদি বলেন যে, লেখাটি সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়েছে, তাহলে আমার বন্দীশালার কাছে একটা বন্দুকের শব্দ কোরো,—তাহলে আমি বুঝব যে, আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে।"

ভাষাবিদ্‌রা লেখাটি দেখে-বললেন যে, লেখাটি চমৎকার এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল! তখন বন্দীশালার কাছে বন্দুকের শব্দ করা হ'ল।

দশম বর্ষের পরে, বন্দী কিছুদিন সারাক্ষণ চুপ করে বসে

থাকত। তারপর নানা ধর্ম্মবিষয়ক বই পড়তে আরম্ভ করলে। জমিদার মশাই তার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলেন,—যে লোক মাত্র চার বছরে ছ' ছ'টা বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করলে, সে কি করে তিন বছর ধরে ক্রমাগত কয়েকখানা ধর্ম্মবিষয়ক বই পড়ে কাটাতে পারে!

এমনি করে তেরটা বছর কেটে গেল। আর দু'বছর মাত্র বাকি ছিল। এই দু'বছরে বন্দী তাড়াতাড়ি করে বিশ্ব-সাহিত্যের যত ভাল ভাল বই পড়তে লাগল। এই সময়ে সে আবার বিজ্ঞানেরও নানা বিভাগের নানা বই পড়তে সুরু করলে।

জমিদার মশাই অবাক হয়ে ভাবতেন,—একটা লোক একই সময়ে কি করে কেমিষ্ট্রি, থিওলজি, ফিললজি ও ফিক্শন পড়তে পারে? ক্ষুধার্ত্ত লোক যেমন করে খাবার খায়, বন্দীও এই দু'বছর ঠিক তেমনি করে একটার পর আরেকটা বই যেন গিলে খেতে লাগ্ল!

দেখতে দেখতে দু'বছর সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল! ডায়েরী খুলেই জমিদারবাবুর মনে পড়ল যে, কাল ঠিক বারটার সময় বন্দীর মুক্তি হবে—কাল বারটায় পনের বছর পূর্ণ হবে।

তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন,—আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাল তাকে কুড়ি হাজার টাকা দিতে হবে। কিন্তু, কুড়ি হাজার টাকা একসঙ্গে এখন দিতে গেলে, কালই ত' আমায় দেউলে হতে হয়!

পনের বছর আগে তাঁর যথেষ্ট টাকা ছিল। সুতরাং তখন কুড়ি হাজার টাকা বাজী ফেলা, তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না; কিন্তু এই পনের বছরে তাঁর জমিদারী প্রায় সবই শেষ হয়ে এসেছে। যৎসামান্য যা আছে, সব বেচে ফেললে তবে যদি কুড়ি হাজার টাকা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে হয়!

জমিদার মশাই অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বললেন,—ওঃ! পনের বছর নির্জ্জন কক্ষে বন্দী হয়ে থেকেও তো সে মরে গেল না! ওর মৃত্যু হলেই ভাল হ'ত!······আমার শেষ পুঁজিটুকু সত্যই কি ওকে দিয়ে আমায় কাল পথের ভিখিরী হতে হবে? আর ও···ও সেই টাকা আমারই চোখের সামনে ভোগ করবে! না, না,—তা হতে পারে না।···ওকে মরতেই হবে!

জমিদার বন্ধুর চোখে একটি হিংস্রতা ফুটে উঠল!

ঘড়ীতে ঘণ্টার আওয়াজ হ'ল। তিনি গুণতে লাগলেন—এক! দুই! তিন! বাইরে তখন বোধহয় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। সম্ভবতঃ তারই একটা শোঁ-শোঁ শব্দ তাঁর কানে ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ভিতরেও কে যেন এক প্রলয়-তুফানের সৃষ্টি করে দিলে!

তিনি একটা বাক্স খুললেন এবং একটা চাবি বার করলেন—একটা মরচে-ধরা চাবি। দেখলেই বোঝা যায় যে, বহুদিন সেই

চাবিটা ব্যবহার করা হয়নি। তারপর দরজা খুলে অতি সাবধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি বাগানের দিকে যেতে লাগলেন। অতি কষ্টে অন্ধকারে তিনি পিছল পথে এগিয়ে চললেন সেই বন্দীশালার দিকে, যেখানে বাগান-বাড়ীতে তাঁর বন্ধু পনের বছর ধরে বন্দী হয়ে আছেন।

বন্দীশালার সামনে এসে তিনি থামলেন। তারপর চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। নাঃ, কেউ কোথাও নেই। এমন কি, যাকে বন্দীর ওপর নজর রাখবার জন্যে রাখা হয়েছে সে লোকটা পর্য্যন্ত না। বৃষ্টির জন্যে বোধ হয় অন্য কোথাও সে আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি ভাবতে লাগলেন,—এই বেলা কাজ হাঁসিল করতে পারলে সন্দেহটা পাহারাদারদের ওপরই পড়বে।

তিনি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাগান-বাড়ীর দরজার বাইরে ঝোলা পনের বছরের পুরোণো তালাটা ধরলেন। হাত তাঁর কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর অতি সাবধানে চাবি লাগিয়ে সেটা খুলে ফেললেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে এক ঝলক আগুন যেন তাঁর শিরায় শিরায় বয়ে গেল!

একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সাবধানে উঠোনটা পেরিয়ে তিনি বন্দীর ঘরের সামনে এলেন। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো বাইরে এসে পড়েছিল। জানালা দিয়ে উঁকি

মেরে তিনি দেখলেন যে, টেবিলের সামনে হাতের ওপর মাথা রেখে বন্দী নিশ্চলভাবে বসে আছে। ঘুমোচ্ছে কি না, তা ঠিক বোঝা গেল না।

জমিদার মশাই পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন, কিন্তু বন্দী তার মধ্যে এক বারও নড়ল না। তখন তিনি জানালায় টোকা মেরে একটা শব্দ করলেন। কিন্তু তবুও বন্দী নিশ্চল। জমিদার মশাই বুঝলেন যে, বন্দী ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং…এই ত' সুযোগ !

ঘরের দরজা খুলে জমিদার মশাই সাবধানে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

জামার ভেতর থেকে একখানা ছোরা বার করে তিনি বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেলেন।

বন্দীর ঠিক সামনেই টেবিলের ওপর একটা কাগজে কি সব লেখা ছিল। জমিদার মশায়ের মনে হ'ল যে, কিছুক্ষণ আগেই বন্দী যেন ওই কাগজে কি সব লিখেছে! তাঁর কৌতূহল হ'ল। তিনি কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

"প্রিয় বন্ধু,

কাল বারটার সময় আমি মুক্তি পাব। কিন্তু আজ আমার মনে কয়েকটা কথা জেগে উঠেছে। সেগুলো তোমায় জানান দরকার বলে আমি মনে করি।

আজ আমার মনে হচ্ছে যে, আমি মুক্তি চাই না, স্বাস্থ্য চাই না, অর্থ চাই না। এই সুদীর্ঘ পনের বছরে বিভিন্ন বই পড়ে

আমি জেনেছি যে, পৃথিবী অসার, টাকার কোন মূল্য নেই। পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়—সবই মরীচিকার মত। স্থতরাং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা টাকাকড়ির ওপর আমার আর কোন মোহ নেই; এবং আমার এ-কথা যে সত্য, তা প্রমাণ করবার জন্যে আমি তোমার কুড়ি হাজার টাকা ছেড়ে দিলাম। এক সময়ে কুড়ি হাজার টাকার স্বপ্নে বিভোর হয়েই আমি এই ঘরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু আজ আমার কাছে কুড়ি হাজার টাকার কোন দাম নেই। স্থতরাং তোমায় যাতে এই টাকা আমায় না দিতে হয়, আমি সেই ব্যবস্থাই করব। নির্দ্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ আগে আমি এ-ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সর্ত্ত ভঙ্গ করব।…"

চিঠিটা পড়তে পড়তে জমিদার মশায়ের চোখ থেকে ঝর্-ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল। তিনি কিছুক্ষণ ধরে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। তারপর বন্ধুর হাতে আলগাভাবে একটা চুমো খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর মন অনুশোচনায় ভরে গেল। বাড়ী ফিরে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখের জল ও উত্তেজনায় অনেকক্ষণ তাঁর ঘুম এল না।…

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি খবর পেলেন যে, বন্দী পালিয়েছে।

—শেষ—